وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক

আল-ইতিছাম

الاعتصام

রবী: আউ:-রবী: আখের ১৪৪৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

Web : www.al-itisam.com

সউদী-তুরস্ক-পাকিস্তান সামরিক চুক্তি
বনাম ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ

মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি: নতুন সুন্নী শক্তি-বলয়!

এই জোট কার বিরুদ্ধে-ইরান? ইসরাঈল? নাকি অন্য কেউ?

বাংলাদেশের কি যুক্ত হওয়া উচিত এই চুক্তিতে?

MONTHLY AL-ITISAM

Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**

Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH

Printed By : Al-Itisam printing press

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210

Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840

E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.

السنة: ١٠، ربيع الأول و ربيع الثاني ١٤٤٨هـ/سبتمبر ٢٠٢٦م العدد: ١١، الجزء: ١١٩

تصدر عن الجامعة السلفية ببنغلاديش

رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৮ ‖ ঈসায়ী ২০২৬ ‖ বঙ্গীয় ১৪৩৩

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
সেপ্টেম্বর-০১	রবি: আউ:- ১৮	মঙ্গলবার	৪.২৪	৫.৪০	১১.৫৯	৩.২৭	৬.১৭	৭.৩৪
সেপ্টেম্বর-০৫	রবি: আউ:- ২২	শনিবার	৪.২৬	৫.৪১	১১.৫৮	৩.২৫	৬.১৩	৭.৩০
সেপ্টেম্বর-১০	রবি: আউ:- ২৭	বৃহস্পতিবার	৪.২৮	৫.৪৩	১১.৫৬	৩.২৩	৬.০৮	৭.২৪
সেপ্টেম্বর-১৫	রবি: আখের - ০৩	মঙ্গলবার	৪.৩০	৫.৪৪	১১.৫৪	৩.২১	৬.০৩	৭.১৮
সেপ্টেম্বর-২০	রবি: আখের - ০৮	রবিবার	৪.৩২	৫.৪৬	১১.৫২	৩.১৯	৫.৫৮	৭.১৩
সেপ্টেম্বর-২৫	রবি: আখের - ১৩	শুক্রবার	৪.৩৪	৫.৪৭	১১.৫১	৩.১৬	৫.৫২	৭.০৮
সেপ্টেম্বর-৩০	রবি: আখের - ১৮	বুধবার	৪.৩৬	৫.৪৯	১১.৪৯	৩.১৩	৫.৪৭	৭.০২

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+১	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০
নরসিংদী	-২	-২	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	-১
টাঙ্গাইল	+১	+১	+২
ফরিদপুর	+৩	+২	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+২
মাদারীপুর	+১	+১	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+১	০	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-১	+১
শেরপুর	০	০	+৩
জামালপুর	+১	+১	+৩
নেত্রকোনা	-৩	-৩	-১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৩	-৪	-৫
কক্সবাজার	-৪	-৫	-৮
খাগড়াছড়ি	-৭	-৭	-৯
রাঙ্গামাটি	-৬	-৭	-৮
বান্দরবান	-৬	-৭	-৯
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩
নোয়াখালী	-২	-২	-৩
লক্ষীপুর	-১	-২	-২
চাঁদপুর	-১	-১	-২
ফেনী	-৩	-৪	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৪	-৪	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৭	-৫
সুনামগঞ্জ	-৬	-৫	-৩
মৌলভীবাজার	-৭	-৭	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-৪

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৭	+৯
নাটোর	+৪	+৫	+৬
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৩
বগুড়া	+৪	+৪	+৪
নওগাঁ	+৪	+৫	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৪	+৬

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+২	+৩	+৬
দিনাজপুর	+৩	+৪	+৭
গাইবান্ধা	+১	+২	+৫
কুড়িগ্রাম	০	+১	+৫
লালমনিরহাট	+১	+২	+৫
নীলফামারী	+৩	+৪	+৮
পঞ্চগড়	+৩	+৫	+৯
ঠাকুরগাঁও	+৫	+৬	+১০

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৪	+৪	+৩
বাগেরহাট	+৪	+৩	+২
সাতক্ষীরা	+৬	+৫	+৪
যশোর	+৫	+৫	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৫	+৫	+৫
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৭
মাগুরা	+৪	+৪	+৪
নড়াইল	+৪	+৩	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+১	০	-১
পটুয়াখালী	+২	+১	-১
পিরোজপুর	+৩	+২	+১
ঝালকাঠি	+২	+১	০
ভোলা	০	০	০
বরগুনা	+৩	+২	০

■ সূত্র : ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org)
■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجلة الإعتصام الشهرية

www.al-itisam.com

মাসিক
আল-ইতিছাম
কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

১০ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং,
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবীউল আওয়াল-রবীউস সানী ১৪৪৮ হিজরী

উপদেষ্টা
শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
মো. আকরাম হোসেন
আব্দুল্লাহ মাহমুদ

বিভাগীয় সম্পাদক
মো: নাসির উদ্দিন, আল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মোঃ নাইমুল ইসলাম

ফাতাওয়া হটলাইন: ০১৪০৭-০২১৮৪২ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০
সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট
monthlyalitisam@gmail.com

সূচিপত্র

» **সম্পাদকীয় ॥ ০২**

» **কুরআনের গভীরে**
সূরা ইউসুফ: হতাশাগ্রস্ত যুবকের জন্য আল্লাহর এক নীরব পাঠশালা (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ৩
-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক

» **প্রবন্ধ**
বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা'আতের সাথে যোগদান করার হুকুম (পর্ব-৫) ৭
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

কুরআন তেলাওয়াতের আদব ১০
-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস

দাম্পত্য জীবনের অবক্ষয় ও ইসলামী সমাধান ১২
-আয়াজ আহমাদ

যেনার দণ্ডবিধি (শাস্তি) ১৬
অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

সফল জীবনের তিন অমূল্য সম্পদ ১৯
-আব্দুল গাফফার মাদানী

» **হারামাইনের মিম্বার থেকে**
আল্লাহর সান্নিধ্যই মুমিনের শ্রেষ্ঠ সম্বল ২৩
অনুবাদ: ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

» **কুরআনের মর্মবাণী**
রবের বাণী (পর্ব-৯) ২৬
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» **খুলুকুল মুসলিম**
পিতা-মাতার সাথে একজন মুসলিমের আচরণ ২৭
অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ বিন সাইদুর রহমান

» **ফাযায়েলে আমল**
ফরয ছালাতের আগে ও পরে সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযীলত ২৮
-মাহবুবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)

» **সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন**
ছালাতের ক্বিয়াম অবস্থার সুন্নাতসমূহ ২৯
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

» **সাময়িক প্রসঙ্গ**
শিশুদের পর্নো আসক্তি থেকে মুক্তির উপায় ৩১
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

» **চিন্তাধারা**
মাঠের উন্মাদনা আর ছালাতে উদাসীনতা: এক দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা ৩৪
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

» **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান**
মাতৃত্ব ৩৭
-সুপ্ত রায়হান সজিব

» **কবিতা ॥ ৪০**

» **সংবাদ ॥ ৪১**

» **সওয়াল-জওয়াব ॥ ৪৩**

সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

সঊদী-তুরস্ক-পাকিস্তান সামরিক চুক্তি বনাম ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ

করোনা মহামারির পর থেকেই বিশ্বরাজনীতিতে বড় বড় পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, আফগানিস্তানে তালেবানের বিজয়, সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের পতন, বাংলাদেশে দীর্ঘ রাজনৈতিক শাসনের অবসান, হামাস-ইসরাঈল যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা, পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাত, মিয়ানমার ও সুদানের গৃহযুদ্ধ—সব মিলিয়ে পৃথিবী যেন নতুন এক অস্থির যুগে প্রবেশ করেছে।

এই পরিবর্তনের সর্বশেষ বড় অধ্যায় ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ। আর ঠিক এই যুদ্ধ চলমান থাকা অবস্থাতেই সঊদী আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে নতুন সামরিক সমীকরণ সামনে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যের এই জটিল পরিস্থিতি বুঝতে হলে আমাদেরকে একটু সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম একটি দেশ সিরিয়া। যেখানে দীর্ঘদিন বাশার আল-আসাদের স্বৈরাচারী শাসন ছিল। দীর্ঘদিন সেখানে গৃহযুদ্ধ চলমান ছিল। প্রায় ২ লাখ মানুষ এই দীর্ঘ শাসনে গৃহযুদ্ধে অথবা জেলখানায় অথবা ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই ভয়াবহ শাসনের অন্যতম সহযোগী ছিল ইরান এবং হিযবুল্লাহ। ফলত আহমাদ আশ-শারার নেতৃত্বে যে মুজাহিদরা ইদলিব থেকে দামেশক পর্যন্ত বিজয় করেছেন, তাদেরও দীর্ঘ সময় ইরান ও তার প্রক্সিদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

অন্যদিকে ইয়ামানে এবং সুদানে আমিরাত ও সঊদী আরব মুখোমুখি অবস্থানে। ইয়ামানে আমিরাত-সমর্থিত পক্ষের নাম সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিল (এসটিসি), যার প্রধান আইদারুস জুবাইদি। আর সুদানে আমিরাত-সমর্থিত মিলিশিয়ার নাম র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস বা আরএসএফ (RSF), যার প্রধান হেমেদেতি। আর সঊদী আরব জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহানের নেতৃত্বাধীন সুদানের জাতীয় সেনাবাহিনী বা এসএএফ (SAF)-এর পক্ষে রয়েছে।

এদিকে ইসরাঈল হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে ভয়ংকর সম্প্রসারণবাদী দেশ। একই সাথে লেবানন, সিরিয়া, গাযা ও ইরান—এই সকল দেশের সাথে ইসরাঈলের সংঘাত চলমান।

সর্বশেষে ইরান নিজেও মধ্যপ্রাচ্যের একটি সম্প্রসারণবাদী চিন্তার অধিকারী রাষ্ট্র। ইরানের শীআ বিপ্লবের পর তারা আরবের বিভিন্ন শীআ-অধ্যুষিত অঞ্চলে একই ধরনের বিপ্লবের জন্য সকল ধরনের চেষ্টা করে। যার ফলশ্রুতিতে ইরাক, ইয়ামান ও লেবাননে অসংখ্য ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র মিলিশিয়া রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হিযবুল্লাহ ও হুথি।

সারমর্ম হিসেবে আমরা বলতে পারি, মধ্যপ্রাচ্যে তিনটি বলয় তৈরি হয়েছে। একটি ইরান ও ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়া গ্রুপ। দ্বিতীয়টি ইসরাঈল ও আমিরাত। তৃতীয়টি সঊদী আরবসহ সুন্নী-অধ্যুষিত আরব দেশগুলো। চতুর্থত, আমেরিকা সকল পক্ষের সাথেই সমন্বয় ও মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে থাকে।

এমন এক চতুর্মুখী সংঘর্ষময় পরিবেশে এই ত্রিদেশীয় চুক্তি ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। চুক্তিটির অফিসিয়াল নাম হচ্ছে, ‘মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি’ (Makkah Joint Defence Agreement)। এই চুক্তিটি মূলত ২০২৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সঊদী আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত ‘কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি’-এর সম্প্রসারিত রূপ। ভবিষ্যতে আরও মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই চুক্তির সবচেয়ে আলোচিত অংশ হচ্ছে, এক দেশের ওপর হামলা সকলের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে। এই তিন রাষ্ট্রের শক্তি একত্র করলে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ power bloc তৈরির সম্ভাবনা দেখা যায়।

সঊদী আরবের রয়েছে বিপুল অর্থনৈতিক সামর্থ্য, জ্বালানি বাজারে প্রভাব, G20 সদস্যপদ এবং মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হিসেবে বিশেষ মর্যাদা। তুরস্ক NATO সদস্য এবং জোটটির দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তি; পাশাপাশি ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক প্রযুক্তিতে তার দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র এবং তার রয়েছে বিশাল যুদ্ধ-অভিজ্ঞ সামরিক বাহিনী।

বাকি অংশ ৫৬ নং পেজে...

কুরআনের গভীরে

সূরা ইউসুফ: হতাশাগ্রস্ত যুবকের জন্য আল্লাহর এক নীরব পাঠশালা

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কারাগার: যেখানে মুমিন গড়ে ওঠে

ইউসুফ আলাইহিস সালাম নির্দোষ হয়েও কারাগারে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কারাগার তাকে তিক্ত বা বিরক্ত করেনি। তিনি সেখানে বসে শুধু নিজের দুঃখের গল্প বলেননি; বরং মানুষের উপকার করেছেন, দাওয়াত দিয়েছেন, স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহর একত্বের দিকে ডেকেছেন। কারাগারে দুই যুবক তার কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে এলো, তিনি তাদের স্বপ্নের শুধু ব্যাখ্যাই দিলেন না, তাদেরকে সঠিক পথের দাওয়াতও দিলেন। তিনি নিজের কষ্টকে অজুহাত বানাননি। তিনি বলেননি, আমি নিজেই বিপদে আছি, তোমাদের কী সাহায্য করব? বরং নিজের অন্ধকারেও তিনি অন্যের জন্য আলো হলেন।

পরিস্থিতি খারাপ হলেই চরিত্র খারাপ হতে হবে—এ কথা সত্য নয়। তার পরিচয় পরিবেশ নির্ধারণ করেনি; তাঁর পরিচয় নির্ধারণ করেছে ঈমান, তাক্বওয়া ও চরিত্র। দাওয়াহর জন্য মঞ্চের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হৃদয়ের আগুন। কারাগারেও দাওয়াহ হতে পারে, সংকটের মাঝেও মানুষকে সত্যের দিকে ডাকা যায়। নিজের দুঃখকে কেন্দ্র করে বসে থাকলে মানুষ ছোট হয়ে যায়, বরং নিজের দুঃখের মধ্যেও অন্যের কল্যাণ ভাবলে মানুষ বড় হয়ে যায়।

মানুষের অকৃতজ্ঞতা:

‘যার সম্পর্কে সে ধারণা করেছিল যে সে মুক্তি পাবে, তাকে সে বলল, তোমার মালিকের কাছে আমার কথা উল্লেখ করো। কিন্তু শয়তান তাকে তার মালিকের কাছে উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিল। ফলে সে কয়েক বছর কারাগারে থাকল’ *(ইউসুফ, ১২/৪২)*।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যখন তারা নিজেরাও অসহায় ছিল। কিন্তু জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরপরই সে ইউসুফ আলাইহিস সালাম -এর অনুরোধ ভুলে গেল। কখনো আমরা কারও উপকার করি, সে ভুলে যায়; কারও পাশে দাঁড়াই, সে ফিরে তাকায় না; কারও জন্য অপেক্ষা করি, সে মনে রাখে না; কারও কাছে আশা রাখি, সে ব্যস্ত হয়ে যায়। মানুষ ভুলে যায় এটাই মানুষের স্বভাব।

কিন্তু যে মানুষ ভুলে গিয়েছিল, আল্লাহ তাকে সঠিক সময়ে মনে করিয়ে দিলেন। বাদশাহর স্বপ্নের সময় সেই কারাগারের সঙ্গী আবার ইউসুফ আলাইহিস সালাম -কে স্মরণ করল। তোমাকে মানুষ ভুলে গেলে ভেঙে পড়ো না। আল্লাহ যদি তোমাকে মনে রাখেন, যথাসময়ে পৃথিবীকেও তোমার প্রয়োজন মনে করিয়ে দেবেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা থেকে রাষ্ট্রনীতি:

বাদশাহ স্বপ্ন দেখলেন। ঘটনাটি কুরআনে এসেছে এভাবে, ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ﴾ ‘বাদশাহ বলল, আমি দেখছি সাতটি মোটা গরু, যাদের খেয়ে ফেলছে সাতটি শুকনো গরু; আর সাতটি সবুজ শিষ এবং অন্যগুলো শুকনো’ *(ইউসুফ, ১২/৪৩)*।

১* ফারেগ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত; বিএ (অনার্স), কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা, সঊদী আরব।

রাজদরবারের লোকেরা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারল না। কিন্তু কারাগারের সেই ভুলে যাওয়া মানুষ হঠাৎ ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে স্মরণ করল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ব্যাখ্যা শুধু 'স্বপ্নের অর্থ' ছিল না, সেটি ছিল পূর্ণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। তিনি বললেন, 'তোমরা ধারাবাহিকভাবে সাত বছর চাষ করবে। তোমরা যা কাটবে, তা শিষের মধ্যেই রেখে দেবে, শুধু অল্প যা খাবে তা ছাড়া। তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, যা তোমরা আগে থেকে যা সঞ্চয় করেছ, তা থেকে খাবে' *(ইউসুফ, ১২/৪৭-৪৮)*।

নির্দোষ প্রমাণের অপেক্ষা: সম্মানের মূল্য

বাদশাহ যখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে কারাগার থেকে ডেকে পাঠালেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসেননি। আগে তিনি নিজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের তদন্ত চাইলেন, ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ 'বাদশাহ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। যখন দূত তার কাছে এলো, সে বলল, তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো সেই নারীদের কী অবস্থা, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল?' *(ইউসুফ, ১২/৫০)*।

তিনি শুধু মুক্তি চাননি, তিনি সত্যের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। অপবাদ মাথায় নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া তার লক্ষ্য ছিল না। তিনি জানতেন, নেতৃত্বের ভিত্তি শুধু দক্ষতা নয়; নৈতিক স্বচ্ছতাও। এখানে আধুনিক সমাজের জন্য বড় শিক্ষা আছে। আমরা অনেক সময় সুযোগ পেলে চরিত্রের প্রশ্ন ভুলে যাই তথা পদ পেলেই চলবে, খ্যাতি পেলেই চলবে, অর্থ পেলেই চলবে— এমন মনোভাব তৈরি হয়। কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম দেখালেন, সম্মানের আগে সত্য, পদের আগে পবিত্রতা এবং ক্ষমতার আগে চরিত্র।

নফসকে নির্দোষ ঘোষণা নয়: আত্মজ্ঞান ও বিনয়

সত্য প্রকাশের পরে সূরা ইউসুফে একটি গভীর আত্মজ্ঞানমূলক বাক্য এসেছে, ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ 'আমি নিজের নফসকে নির্দোষ ঘোষণা করছি না। নিশ্চয়ই নফস মন্দের দিকে প্রবলভাবে আদেশ করে, তবে আমার রব যার উপর দয়া করেন' *(ইউসুফ, ১২/৫৩)*।

এই আয়াত মানুষের আত্মচিন্তার আয়না। মানুষের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু কখনো বাইরের মানুষ নয়, নিজের নফস। যে মানুষ নিজের নফসকে চেনে না, সে নিজেকে নিরাপদ ভাবে; আর যে নিজেকে নিরাপদ ভাবে, সে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। নিজের ভেতরের অহংকার, কামনা, প্রতিশোধস্পৃহা, স্বীকৃতিলিপ্সা, অলসতা, হিংসা, আত্মপ্রবঞ্চনা—এসবও চিনতে হবে। আত্মশুদ্ধির শুরু এখানেই, আমি নিজেকে ফেরেশতা ভাবব না; আমি হব আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী।

যোগ্যতা প্রকাশ অহংকার নয়, যদি সমাজের প্রয়োজন থাকে:

যখন বাদশাহ ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর মর্যাদা ও আস্থা স্বীকার করলেন, তখন কুরআন বলে, ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ 'বাদশাহ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার বিশেষ কাজে নিয়োজিত করব। যখন সে তার সঙ্গে কথা বলল, সে বলল, আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাবান ও বিশ্বস্ত' *(ইউসুফ, ১২/৫৪)*।

এরপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ 'সে বলল, আমাকে দেশের ভাণ্ডারসমূহের দায়িত্ব দিন; নিশ্চয়ই আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও জ্ঞানসম্পন্ন' *(ইউসুফ, ১২/৫৫)*।

এখানে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য আছে। সাধারণভাবে মানুষ নিজের প্রশংসা করবে না। কিন্তু যখন সমাজের প্রয়োজন, নিজের যোগ্যতা অজানা এবং দায়িত্ব গ্রহণ করলে মানুষের উপকার হবে, তখন নিজের সক্ষমতা জানানো অহংকার নয়; বরং দায়িত্ববোধ। আজ আমাদের সমাজে দুই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। একদল অযোগ্য হয়েও পদ চায়; আরেকদল যোগ্য হয়েও ভয়ে, সংকোচে, আত্মবিশ্বাসের অভাবে দায়িত্ব নেয় না। সূরা ইউসুফ দ্বিতীয় দলকে বলে, যদি তুমি সত্যিই যোগ্য হও, আমানত রক্ষা করতে পার, জ্ঞান থাকে এবং সমাজের উপকার হয়; তবে দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যেয়ো না।

তবে শর্ত দুটি حَفِيظٌ ও عَلِيمٌ অর্থাৎ সততা ও দক্ষতা। শুধু সৎ হলেই হবে না, দক্ষতাও চাই; শুধু দক্ষ হলেই হবে না, সততাও চাই। সৎ কিন্তু অদক্ষ ব্যক্তি অনেক সময় ভালো উদ্দেশ্য নিয়েও ক্ষতি করে, আর দক্ষ কিন্তু অসৎ ব্যক্তি সমাজকে ধ্বংস

করে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর নেতৃত্বের মূলনীতি হলো নৈতিকতা ও জ্ঞানের মিলন।

সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকে:

ইউসুফ আলাইহিস সালাম দায়িত্ব পেলেন, মন্ত্রী হলেন এবং মিথ্যা অপবাদের কারাগার-জীবন থেকে রাজসিংহাসনের পথে যাত্রা করলেন। আল্লাহর কোন পরীক্ষার মধ্যে কী কল্যাণ নিহিত আছে, তা আমরা কেউ জানি না। নিষ্পাপ অবস্থায় জেলে গিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহকে দোষ দেননি এবং রবের সিদ্ধান্তের প্রতি তার কোনো আফসোস ছিল না। তিনি ভবিষ্যৎ জানতেন না, কিন্তু কারণ ছাড়াই বিপদে পড়ে রবের প্রতি শিকায়েত আর সন্দেহের তীর নিক্ষেপ করেননি। কোনো আফসোস ছাড়াই জেলে বসেও তিনি রবের পথেই মানুষকে ডেকেছেন।

আমি-আপনি হলে কী করতাম? হয়তো বলতাম, আল্লাহ! আমি তো নির্দোষ, তাও এই শাস্তি দিচ্ছ কেন? দুর্বল ঈমানের কেউ হলে হয়তো বলত, আমি আল্লাহর কোনো সীমালঙ্ঘন করিনি, তাও তিনি আমাকে শাস্তি দিলেন কেন? তাহলে পরহেজগার থাকার উপকার কী? ইউসুফ আলাইহিস সালাম আমাদের শিখিয়েছেন, কঠিন বিপদের মাঝেও আল্লাহর উপর ভরসা করে মুক্তির অপেক্ষা করা এবং রবকে ডাকতে ভুলে না যাওয়া।

আরেকটি বিষয় হলো কুরআন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর এই উত্থানকে শুধু রাজনৈতিক উত্থান হিসেবে বর্ণনা করেনি; বরং আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে বর্ণনা করেছে, ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ‘এভাবেই আমি ইউসুফকে দেশে প্রতিষ্ঠা করে দিলাম; সে সেখানে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করত। আমি যাকে চাই, আমার রহমত পৌঁছে দিই। আর সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করি না’ *(ইউসুফ, ১২/৫৬)*।

মানুষ দেখে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম পরিকল্পনা করলেন, ব্যাখ্যা দিলেন এবং পদ পেলেন। আর কুরআন বলে, আল্লাহ তাকে এগুলো দিয়েছেন। এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। মানুষ চেষ্টা করে, যোগ্যতা অর্জন করে, সততা ধরে রাখে; কিন্তু দরজা খুলে দেন আল্লাহ। সেটা তিনি চাইলে দুনিয়ায় খুলবেন, চাইলে আখেরাতে। আজকের যুবক যদি সফলতা চায়, তবে তাকে দুই কাজ একসাথে করতে হবে তথা যোগ্যতা অর্জন এবং আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষিতা। শুধু দু‘আ করে দক্ষতা অর্জন না করলে চলবে না; আবার শুধু দক্ষতা নিয়ে আল্লাহকে ভুলে গেলেও চলবে না।

ক্ষমতা ও ক্ষমা:

বাদশাহর স্বপ্ন এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর তাবীর বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী দুর্ভিক্ষ শুরু হলো। মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সরকারের কাছে গুদামজাত খাবার সংগ্রহের জন্য সাধারণ মানুষ আসতে থাকল। সেই সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরাও ছিল। তিনি তাদের চিনতেও পারলেন, ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ ‘ইউসুফের ভাইয়েরা এলো এবং তার সামনে প্রবেশ করল। সে তাদের চিনল, কিন্তু তারা তাকে চিনল না’ *(ইউসুফ, ১২/৫৮)*।

যারা একদিন তাকে অসহায় অবস্থায় কূপে ফেলেছিল, আজ তারা তার সামনে প্রয়োজন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। যে হাত তাকে দূরে সরিয়েছিল, আজ সেই হাত খাদ্যের জন্য প্রসারিত। যে মুখ মিথ্যা বলেছিল, আজ সেই মুখ অজান্তে তার কাছেই সাহায্য চাইছে। কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রতিশোধের নেশায় আক্রান্ত হননি এবং ক্ষমতার চূড়ায় দাঁড়িয়েও তিনি প্রতিশোধ নেননি। তার ভাইয়েরা তাকে কূপে ফেলেছিল, তার শৈশব কেড়ে নিয়েছিল, তাকে পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, তার জীবনের পথকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল; কিন্তু যখন তারা তার সামনে অসহায় হয়ে দাঁড়াল, তিনি বললেন, ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ‘সে বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো ভর্ৎসনা নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, আর তিনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু’ *(ইউসুফ, ১২/৯২)*।

এমন ক্ষমা দুর্বলতার ক্ষমা নয়, এটি শক্তির ক্ষমা। দুর্বল মানুষ অনেক সময় ক্ষমা করে, কারণ তার প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা নেই; কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম ক্ষমা করলেন তখন, যখন তার হাতে ক্ষমতা ছিল। ক্ষমতা থাকা অবস্থায় ক্ষমা করতে পারাটাই প্রকৃত ক্ষমা। আজকের সমাজে আমরা ক্ষুদ্র অপমানও ভুলতে পারি না। সামান্য মন্তব্য, সামান্য সমালোচনা, সামান্য অসম্মানের কারণে আমাদের মনে বছরের পর বছর আমরা বিদ্বেষের আগুন

জ্বালিয়ে রাখি। অথচ ইউসুফ আলাইহিস সালাম জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করলেন। ক্ষমা মানে অন্যায়কে বৈধ করা নয়, বরং ক্ষমা মানে হৃদয়কে প্রতিশোধের কারাগার থেকে মুক্ত করা।

ছবর ও তাক্বওয়া: সফলতার কুরআনিক সূত্র

‘আমি ইউসুফ, আর এ আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধরে, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না’ *(ইউসুফ, ১২/৯০)*।

স্বপ্ন পূরণ হলে অতীতকে নতুন চোখে দেখা যায়:

সূরার শেষ প্রান্তে এসে সেই প্রথম স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটে। কুরআন বলে, ‘যখন তার ভাইয়েরা পিতা-মাতাসহ তার সামনে এলো, তখন সে তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে তুলে বসাল আর তার ভাইয়েরা তার সামনে সিজদাবনত হলো’ *(ইউসুফ, ১২/১০০)*।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমার রব তা সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন এবং আপনাদের মরু অঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছেন। লক্ষণীয় যে, তিনি অতীতকে স্মরণ করেছেন; কিন্তু বলেননি যে তার ভাইয়েরা তাকে কূপে ফেলেছিল, বিক্রি করেছিল কিংবা তার প্রতি অন্যায় করেছিল। তিনি শেষ দৃশ্যে অতীতকে অভিযোগের ভাষায় নয়, আল্লাহর অনুগ্রহের ভাষায় পড়লেন। তিনি আল্লাহর লুৎফ, হিকমাহ ও জ্ঞানের কথা বললেন, ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ ‘নিশ্চয়ই আমার রব যা চান, তা সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়’ *(ইউসুফ, ১২/১০০)*।

মানুষ যখন পরীক্ষার ভেতরে থাকে, তখন শুধু অন্ধকার দেখে; কিন্তু যখন আল্লাহ পরিণতি দেখান, তখন বুঝা যায় যে, এই অন্ধকারও প্রয়োজন ছিল। কূপ না হলে মিশর ছিল না, মিশর না হলে প্রাসাদ ছিল না, প্রাসাদ না হলে চরিত্রের পরীক্ষা ছিল না, পরীক্ষা না হলে কারাগার ছিল না, কারাগার না হলে স্বপ্নের ব্যাখ্যার দরজা খুলত না এবং আর সেই দরজা না খুললে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও আসত না। জীবনের প্রতিটি বেদনা আলাদা করে দেখলে অসংলগ্ন লাগে; কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনার আলোকে দেখলে বোঝা যায়, সব টুকরো মিলে এক মহৎ নকশা।

সফলতার শেষ ভাষা:

স্বপ্ন পূর্ণ হলো, ক্ষমতার চেয়ারেও বসলেন, পরিবার মিলিত হলো। তারপরও যেন তিনি কামিয়াব নন, এখনও কী যেন বাকি আছে তার! কী আশ্চর্য! দুনিয়া-অর্জনের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে তিনি কী কামনা করছেন? স্বপ্ন পূরণের পরেও তিনি তার প্রতিপালকের কাছে কী চাইছেন?

কুরআনের ভাষায়, ‘হে আমার রব! আপনি আমাকে রাজত্ব/ক্ষমতা থেকে অংশ দিয়েছেন এবং আমাকে কথার ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! আপনি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সঙ্গে যুক্ত করুন’ *(ইউসুফ, ১২/১০১)*।

তার শেষ কামনায় ফুটে উঠেছে, দুনিয়ার সফলতাই প্রকৃত সফলতা নয়। আমরা নিজেরা কেউ মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হলে ভাবতাম, আমরা বুঝি সফল। কিন্তু সফল তো সেই, যে আখেরাতে সফল হবে। কেউ যদি দুনিয়ায় কিছুই না পায়, শুধু আখেরাত হাছিল করতে পারে, তাহলেও সে সফল। আর কেউ যদি দুনিয়ায় সব কিছু পেয়েও পরপারে আল্লাহর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে সে বিফল। আর কেউ যদি দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই পায়, তবে সে তো অবশ্যই সফল।

মুমিনের সফলতার আসল সৌন্দর্য হলো সে সফলতার পর আল্লাহকে ভুলে যায় না, মর্যাদা পেয়ে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে না। সে জানে, যে আল্লাহ কূপ থেকে রক্ষা করেছেন, তিনিই প্রাসাদেও রক্ষা করবেন; যে আল্লাহ কারাগারে সঙ্গে ছিলেন, তিনিই ক্ষমতার আসনেও সঙ্গে থাকবেন। আজকের যুবক এমন সফলতাই চাইবে, যা তাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না; এমন জ্ঞান, যা অহংকার নয়, বিনয় বৃদ্ধি করে; এমন পদ, যা মানুষকে শোষণ নয়, সেবা করতে শেখায়; আর এমন জীবন, যার শেষ প্রার্থনা হবে—‘তাওয়াফফানী মুসলিমান’ অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ! আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন’। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!

বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা'আতের সাথে যোগদান করার হুকুম

মূল: ড. বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ
পরিমার্জন: সা'দ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হুছায়্যিন
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-৫)

উত্তর[৩]

অতএব বিভিন্ন দল, ফেরক্বা ও জামা'আতে বিভক্ত হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত প্রশ্নটির উত্তর নিচের বিষয়গুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়:

দ্বীন ইসলামের অপরিহার্য জ্ঞান থেকে নিম্নবর্ণিত মূলনীতি সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়:

» জামা'আত ছাড়া কোনো দ্বীন নেই।

» ইমামত (নেতৃত্ব) ছাড়া কোনো জামা'আত নেই।

» আর শ্রবণ ও আনুগত্য ছাড়া কোনো ইমামত নেই।

আর এই তিনটি বিষয় একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মুসলিম নেতৃত্বের অধীনে ইসলাম ও মুসলিম জামা'আতের টিকে থাকা এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধন—এই ভিত্তি ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

আর উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে যা বর্ণিত হয়ে থাকে যে, তিনি বলেছেন, لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ 'জামা'আত ছাড়া কোনো ইসলাম নেই, ইমামত ছাড়া কোনো জামা'আত নেই এবং আনুগত্য ছাড়া কোনো নেতৃত্ব নেই'—যা ইমাম দারেমী বর্ণনা করেছেন, এর সনদে ছফওয়ান ইবনে রুস্তম নামক একজন 'মাজহূল' (অজ্ঞাতপরিচয়) বর্ণনাকারী রয়েছেন।

সকল মুসলিম একটি অভিন্ন দেহ; আর ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ প্রতিটি মানুষ সেই দেহেরই একে অপরের সাথে মিশে থাকা একেকটি অঙ্গ।

আর এই দেহের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে ইসলাম তথা কিতাব ও সুন্নাহ-এর ওপর এবং এটিই হলো একে পরিচালনার দ্বীনী নীতি।

আর এর পবিত্রতা রক্ষা করার এবং এর জামা'আতের ঐক্য সুদৃঢ় রাখার নিশ্চয়তা বিধান করা হয় এর জন্য একজন নেতা নিযুক্ত করার মাধ্যমে, যা 'আহলুল হাল ওয়াল আকদ' বা শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ-এর বায়'আত দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাদের সংখ্যা যতই কম হোক-না কেনো। আর এটিই হলো সেই দেহের প্রশাসনিক নীতি।

সুতরাং উম্মাহর এই বর্ধিষ্ণু দেহটি গঠনের মূল ভিত্তি হলো ইসলাম; আর ইমামত বা নেতৃত্ব হলো দ্বীন ও দুনিয়ার সার্বিক বিষয়ে সেই দেহটিকে পাহারা দেওয়ার বা রক্ষা করার একটি মাধ্যম মাত্র।

আর ইসলাম হলো এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়, যা কোনো প্রকার বিভক্তি বা বিভাজন গ্রহণ করে না। তাই নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম এবং আমাদের এই যুগ পর্যন্ত যারা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দিকেই আহ্বান করেন; এর কোনো একটি বিশেষ অংশের দিকে নয়।

আর যারা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করে এবং কিছু অংশ অস্বীকার করে, আল্লাহ তাআলা তাদের তীব্র নিন্দা ও ভর্ৎসনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ 'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আনো আর কিছু অংশকে অস্বীকার করো?' *(আল-বাক্বারাহ, ২/৮৫)*।

---

*বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৩. সম্মানিত পাঠক! মূল প্রশ্নটি ছিল: **দাওয়াতী কাজে সক্রিয় সমসাময়িক দল ও সংগঠনগুলোতে যোগদানের শারঈ বিধান কী?**

ঠিক একইভাবে, যে ব্যক্তি সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে ইসলামের কোনো নির্দিষ্ট অংশের দিকে আহ্বান করে এবং অন্যান্য অংশকে বাদ দেয়, তার ব্যাপারেও কঠোর নিন্দা ধ্বনিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ 'অতএব আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পর তারা আর কোন কথায় ঈমান আনবে?' *(আল-জাছিয়া, ৪৫/৬)*।

আর নবুঅতের আদর্শ ও পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিমদের জামা'আত কোনো প্রকার খণ্ডন বা বিভাজন মেনে নেয় না। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুম ও যারা উত্তমরূপে তাঁদের অনুসরণ করেছেন, তাদের সকলের দাওয়াত ছিল তাওহীদের পতাকা বহনকারী মুসলিমদের একটি মূল জামা'আত গঠনের জন্য; মুসলিমদের মধ্য থেকে কোনো একটি নির্দিষ্ট উপদল বা খণ্ডিত জামা'আত গঠনের জন্য নয়।

আর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তারাই হলেন- মুসলিম, তারাই হলেন- সাহায্যপ্রাপ্ত দল (আত-তয়িফাতুল মানছূরাহ), তারাই হলেন- নাজাতপ্রাপ্ত দল (আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ) এবং তারাই হলেন- সালাফে ছালেহীন। আর তারাই হলেন দ্বীন পালনে এবং এর দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ছাহাবীগণ যে আদর্শের ওপর ছিলেন, সেই একই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ। আর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা আলাদা হয়ে যাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন; ঠিক যেভাবে তিনি তাঁদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। আর এ ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহর অসংখ্য দলীল বিদ্যমান রয়েছে।

মুসলিমদের জামা'আতের আদর্শ হলো- নবুঅতের মানহাজ তথা কিতাব ও সুন্নাহ-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসলাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ 'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তাদের পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন; যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল' *(আলে ইমরান, ৩/১৬৪)*।

এখানে ইসলাম কিতাব ও সুন্নাহ ব্যতীত অন্য সব ধরনের বিশেষ অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা বিলুপ্ত করেছে। তাই পরিচর্যা, সাহায্য-সহযোগিতা এবং ওয়ালা ও বারা তথা আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদ-এসব ক্ষেত্র থেকে এ দুটি ছাড়া অন্য যেকোনো ক্ষেত্রকে ইসলাম ছুড়ে ফেলেছে। আর এ দুটির চূড়ান্ত ফলাফল তথা তাক্বওয়া-কেই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন, ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাক্বওয়াবান' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*।

অতএব, মুসলিম জামা'আতের তাক্বওয়ার পরিমাণ নির্ধারিত হয় মহিমান্বিত অহীদ্বয় তথা কুরআন ও সুন্নাহ-এর ওপর তাদের অনুসরণের অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে। আর এই দুই অহী-ই হলো 'ওয়ালা ও বারা' (ভালোবাসা ও সম্পর্কচ্ছেদ)-এর প্রকৃত মানদণ্ড। সুতরাং এই দুই অহীর যতটা অংশ অনুসৃত হবে, সেই অনুপাতেই ওয়ালা বা ভালোবাসা নির্ধারিত হবে; আর যতটুকু বিচ্যুতি বা ঘাটতি ঘটবে, সেই অনুপাতেই বারা বা সম্পর্কচ্ছেদ ও বিমুখতা প্রযোজ্য হবে।

আর এই নীতি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে সুবিন্যস্ত ও যথার্থ হতে পারে, যারা সরল পথ (ছিরাতে মুস্তাক্বীম) ও সুদৃঢ় আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন—অর্থাৎ নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবীগণ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুম যে নীতির ওপর ছিলেন, সেই নীতির ওপর যারা রয়েছেন। আর তাঁরাই হলেন- মুসলিম জামা'আত।

এটিই হলো মুসলিম জামা'আতের প্রকৃত মর্মার্থ, তাঁরা কিতাব ও সুন্নাহ তথা নবুঅতের আদর্শের ভিত্তিতে পরস্পরের ভাই ভাই, যাঁদেরকে একজন ক্ষমতা ও শক্তিসম্পন্ন শাসক ঐক্যবদ্ধ করে রাখেন। আর এগুলোই হলো মুসলিমদের পারস্পরিক ঐক্যের এবং তাঁদের জামা'আতের সুদৃঢ় বন্ধনের সাধারণ যোগসূত্র। আর এতে যতটুকু ত্রুটি ঘটবে, ঠিক সেই পরিমাণেই মতবিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

সুতরাং যদি মুসলিমদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিংবা কোনো দল তাঁদের থেকে আলাদা হয়ে যায়, তবে তা-ই হবে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং তাঁদের জামা'আতের মাঝে ভাঙন তৈরি। প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, এটিই নবুঅতের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমগ্র ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

আর এটি নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেওয়া সেই অছিয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত, যাতে তিনি সমস্ত উপদল বর্জন করার এবং মুসলিমদের মূল জামা'আতের সাথে অবিচ্ছেদ্য থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ এই ব্যক্তি মুসলিমদের জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাঁদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া উপদলের সাথে কোনো নাম অথবা প্রতীকের মাধ্যমে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। আর মূল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই দলটি ইসলাম এবং মুসলিম জামা'আতের কতটা কাছাকাছি বা কতটা দূরে অবস্থান করছে, তা নির্ভর করে তাদের কাছে ইসলামের কোন মৌলিক নীতি টিকে রয়েছে এবং কতগুলো শাখা-প্রশাখাগত বিষয় অবশিষ্ট রয়েছে, তার পরিমাণের ওপর।

আর ইসলামের বিধানসমূহের কাঠামোগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়া মানে হলো- এর কোনো একটি ধমনি কেটে রক্তক্ষরণ ঘটানো; যার ফলে শরীর থেকে যতটুকু রক্ত ঝরে যাবে, শরীর ঠিক সেই পরিমাণেই দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে।

আর যখন সৎকাজে শ্রবণ ও আনুগত্যের নীতিতে বিঘ্ন ঘটে, তখন সমগ্র দেহে এবং এর কাঠামোতে জঘন্য বিপর্যয় ও ভাঙন দেখা দেয়; আর ঠিক তখনই শাসক বা শাসন কর্তৃপক্ষের দুর্বলতার কারণে জামা'আতের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়।

অতএব, ওয়ালা-বারা (আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা), দাওয়াত-জিহাদ, ওয়ায ও দিকনির্দেশনা, নছীহত-উপদেশ এবং কথা-কাজে আমল করে যাওয়া— এই সবকিছু ও এর আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ কেবল নবুঅতের আদর্শের রূপরেখা অনুযায়ীই পরিচালিত হবে; অন্য কিছুর ভিত্তিতে নয়।

সুতরাং 'ইসলাম' নাম ছাড়া অন্য কোনো নামের ভিত্তিতে বন্ধুত্বের চুক্তি বা সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয নেই, কিংবা ইসলামের রূপরেখা ছাড়া অন্য কোনো রূপরেখার ভিত্তিতে— তাতে কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করে—বন্ধুত্বের বন্ধন তৈরি করা বৈধ নয়, অথবা অন্য কোনো জামা'আতের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কোনো একটি দলের বিশেষ নামের ছায়াতলে এসে অন্য মুসলিমদের বাদ দিয়ে কেবল কিছু মুসলিমের সাথে পক্ষপাতমূলক বন্ধুত্ব করাও জায়েয নয়; বরং এটি হতে হবে নবুঅতের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত জামা'আতের অর্থাৎ মুসলিমদের মূল জামা'আতের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে।

অতএব,

» যদি কোনো ইসলামী দল বা সংগঠন এমন কোনো সুনির্দিষ্ট নবাবিষ্কৃত স্লোগান বা প্রতীকের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ভিত্তিতেই ওয়ালা ও বারা (বন্ধুত্ব ও শত্রুতা) নির্ধারিত হয়

» যদি তা এমনভাবে গঠিত হয় যে, আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তার কিছু অংশ তারা মেনে চলে আর কিছু অংশ বর্জন করে

» যদি তা এমন হয় যে, যারা কেবল তাদের দলে বা সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তারা ছাড়া অন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব করে না

» যদি তা এমন কোনো দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অধিবাসীরা ইতোমধ্যেই সেই নবুঅতের আদর্শের ওপর রয়েছেন, যার ওপর সালাফে ছালেহীন তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত অতিবাহিত করেছেন; অথচ এই নতুন দলটি কোনো মৌলিক কিংবা আংশিক বিষয়ে কোনো নাম বা প্রতীকের মাধ্যমে তাদের বিরোধিতা করে

তবে এই সমস্ত চুক্তি সম্পূর্ণরূপে হারাম ও অবৈধ। কারণ এর মধ্যে রয়েছে সীমালঙ্ঘন এবং ইসলামের বিভিন্ন দিক-বিভাগের ক্ষতি সাধন। আরও রয়েছে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া, মূল তথা মুসলিমদের জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ঘোষণা দেওয়া, তাঁদের সংহতি বিনষ্ট করা এবং তাঁদের ঐক্য ভেঙে দেওয়া।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

কুরআন তেলাওয়াতের আদব

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস[*]

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। এটি শুধু পাঠ করার গ্রন্থ নয়, বরং জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। তাই কুরআন তেলাওয়াত একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত, যা সঠিক শিষ্টাচার ও আদবের সাথে সম্পন্ন করা জরুরী। আদব মেনে কুরআন তেলাওয়াত করলে তা শুধু মৌখিক পাঠে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা হৃদয়কে আলোকিত করে এবং জীবনকে ইলাহী আলোয় উদ্ভাসিত করে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কুরআন তেলাওয়াতের আদব সংক্রান্ত আলোচনা করা হলো।

(১) খালেছ নিয়্যতে কুরআন পড়া: কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের আদব হলো, আল্লাহর জন্য নিয়্যতকে খালেছ করা। কারণ কুরআন তেলাওয়াত একটি মহৎ ইবাদত, যার মূল ভিত্তি ইখলাছের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা না থাকলে তা বাতিল হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾ 'সুতরাং আপনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করুন' *(আয-যুমার, ৩৯/২)*। তিনি আরও বলেন, ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ 'তাদেরকে একমাত্র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে খাঁটি মনে ইখলাছের সঙ্গে' *(আল-বায়্যিনাহ, ৯৮/৫)*।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো এবং এ তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করো। এ আমল করো ঐ সম্প্রদায়ের আগমনের পূর্বে, যারা কুরআন তিরের মতো সোজা করে পড়বে, কুরআন দ্রুত পড়বে তথা এর দ্বারা দুনিয়ার প্রতিদান তালাশ করবে আর পরকালের জন্য তেলাওয়াত করবে না'।[৫]

(২) উপস্থিত মন নিয়ে তেলাওয়াত করা: যা পড়বে, তা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করবে, এর অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করবে, সে সময় তার অন্তর বিনয়ী হবে এবং সে নিজের অন্তরকে এমনভাবে হাযির করবে, যেন এ কুরআনে আল্লাহ তার সঙ্গে সংলাপ করছেন। তিনি বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করেছেন। সেজন্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে বুঝে তা পালন করা আবশ্যক। আর আদেশ-নিষেধ অনুধাবন করা কুরআন তেলাওয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ কুরআন তো মহান আল্লাহর বাণী *(ছোয়াদ, ৩৮/২৯; মুহাম্মাদ, ৪৭/২৪)*।

(৩) আয়াতের সাথে প্রভাবিত হওয়া: প্রত্যেকটি আয়াতের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম)-এর ঘটনাবলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা যে, কীভাবে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল, কীভাবে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, মুত্তাক্বীদের কী পরিণতি হয়েছিল ইত্যাদি। আমাদের এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।

(৪) পবিত্র অবস্থায় তেলাওয়াত করা: এটা আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ। অপবিত্র ব্যক্তি অর্থাৎ যার উপর গোসল ফরয, এমন ব্যক্তি গোসল না করা পর্যন্ত কুরআন পাঠ করবে না। সম্ভব হলে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে, যদি পানি না পাওয়া যায় কিংবা রোগের কারণে ব্যবহার করতে অক্ষম হয়, তাহলে তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করবে।

(৫) মিসওয়াক করা: কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা উচিত। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ، فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ 'তোমাদের মুখ হলো কুরআনের রাস্তা। অতএব, তোমরা মিসওয়াক করে তা পবিত্র ও সুগন্ধযুক্ত করো'।[৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَطَهِّرُوْا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ 'অতএব, তোমরা কুরআনের জন্য তোমাদের মুখকে পবিত্র করো'।[৭]

(৬) নোংরা জায়গা বা মনোযোগ নষ্ট করবে এমন জনসম্মুখে কুরআন তেলাওয়াত না করা: নোংরা কিংবা এমন স্থান যেখানে তেলাওয়াত শোনার মতো পর্যাপ্ত একাগ্রতার অভাব, সেখানে কুরআন তেলাওয়াত করা কুরআনকে অপমান করার শামিল। টয়লেট কিংবা পেশাব-পায়খানার জন্য বরাদ্দকৃত স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয নেই। কারণ এসব স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করা মানে কুরআনের মর্যাদার সঙ্গে মানানসই নয়।

(৭) তেলাওয়াতের শুরুতে আঊযুবিল্লাহ... ও বিসমিল্লাহ... পড়া: কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে আরেকটি আদব হলো, তেলাওয়াতের শুরুতে আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম পড়া। কেননা আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ 'যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবেন' *(আন-নাহল, ১৬/৯৮)*। যাতে করে শয়তান কুরআন তেলাওয়াত থেকে কিংবা তেলাওয়াত পরিপূর্ণ করা থেকে বাধা না দিতে পারে।

৪* বিএ, অনার্স, হাদীছ বিভাগ, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৫. আহমাদ, হা/১৪৮৯৮; আবূ দাঊদ, হা/৮৩০; মিশকাত, হা/২২০৬, হাদীছটি ছহীহ।

৬. ইবনু মাজাহ, হা/২৯১; সিলসিলা ছহীহা, হা/১২১৩।

৭. সিলসিলা ছহীহা, হা/১২১৩; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২১৫।

www.al-itisam.com

তবে সূরার মাঝখান থেকে তেলাওয়াত শুরু করলে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়বে না। সূরা শুরু থেকে পাঠ করলে বিসমিল্লাহ... বলবে। অবশ্য সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ... পড়বে না। কারণ এ সূরার সূচনায় বিসমিল্লাহ... নেই।

(৮) কণ্ঠ সুন্দর করা এবং সুর দিয়ে তেলাওয়াত করা: সুর দিয়ে তেলাওয়াত করা সুন্নাত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ 'আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু এমনভাবে শ্রবণ করেন না, যেভাবে তিনি সুন্দর স্বরবিশিষ্ট নবীর পড়াকে শ্রবণ করেন। যিনি কুরআন তথা কিতাবকে সুর দিয়ে পড়েন'।[৮]

(৯) তারতীলসহ বা ধীরস্থিরভাবে সুন্দররূপে তেলাওয়াত করা: মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ 'আর আপনি কুরআনকে তারতীলের সঙ্গে তথা ধীরস্থিরভাবে থেমে থেমে সুন্দররূপে তেলাওয়াত করুন' *(আল-মুযযাম্মিল, ৭৩/৪)*। কুরআন তেলাওয়াত করবে ধীরস্থিরভাবে, দ্রুত নয়। কারণ ধীরস্থিরভাবে তেলাওয়াত করা শব্দ ও অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারণ এবং কুরআনের অর্থ অনুধাবনে অধিক সহায়ক। ক্বাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا. ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, তার ক্বিরাআত ছিল দীর্ঘ আকারের। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টেনে টেনে পড়তেন। এরপর তিনি পড়লেন, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ তিনি بِسْمِ اللهِ (বিসমিল্লাহ) দীর্ঘ করলেন, الرَّحْمَنِ (রহমান) দীর্ঘ করলেন আর الرَّحِيمِ (রহীম) দীর্ঘ করলেন।[৯] অবশ্য এমন দ্রুত পাঠে কোনো সমস্যা নেই, যেখানে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না।

(১০) গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করা: গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের জন্য একই আয়াত বারবার তেলাওয়াত করা যায়। আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছালাতে দাঁড়িয়ে ভোর হওয়া পর্যন্ত একটি আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতে থাকেন। আয়াতটি হলো ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ 'আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করেন; তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(আল-মায়েদা, ৫/১১৮)*।[১০]

(১১) বিনম্রভাবে তেলাওয়াত করা: বিনম্রভাবে বা কান্নাজড়িত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করা। যেমন আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/১০৯)*। মুত্বাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি ছালাত আদায় করছিলেন এবং তাঁর ভিতর থেকে টগবগে আওয়াজ হচ্ছিল। যেমন ডেগের ফুটন্ত পানির টগবগ আওয়াজ হয় অর্থাৎ তিনি কান্না করছিলেন।[১১]

(১২) রহমতের আয়াত আসলে তা চাওয়া এবং আযাবের আয়াত আসলে তা হতে আশ্রয় চাওয়া: কুরআন তেলাওয়াতকালে রহমতের আয়াত আসলে আল্লাহর নিকটে রহমত প্রার্থনা করা এবং আযাবের আয়াত আসলে তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা কর্তব্য।[১২]

(১৩) তেলাওয়াতে সিজদা করা: কুরআন তেলাওয়াতকারী যখন সিজদার আয়াত পড়বেন, তখন আয়াত পূর্ণ করে তেলাওয়াতে সিজদা দিবেন। সিজদা আদায়ের নিয়ম হলো সিজদার জন্য প্রথমে 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যাবে এবং সিজদায় গিয়ে বলবে,

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

অতঃপর সিজদা থেকে তাকবীর ছাড়াই উঠবে এবং সালাম ফেরাবে না। কারণ তেলাওয়াতে সিজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর ও সালাম দেওয়ার কোনো বর্ণনা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাওয়া যায় না। তবে যদি তেলাওয়াতে সিজদাটি ছালাতের মধ্যে হয়, তখন সিজদা দেওয়ার সময় এবং সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়ও তাকবীর দিবে।[১৩]

(১৪) কুরআন তেলাওয়াত শেষে দু'আ করা: কুরআন তেলাওয়াত শেষে চুমু খাওয়া ও 'ছাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলার কোনো দলীল পাওয়া যায় না। বরং কুরআন তেলাওয়াত শেষে বলতে হয়, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ **উচ্চারণ:** 'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া-বিহামদিকা, আশহাদু আল-লা ইলা-হা ইল্লা আংতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'। **অর্থ:** 'মহাপবিত্র আপনি, হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি'।[১৪]

বাকি অংশ ১৮ নং পেজে...

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৩, ৫০২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৯২; মিশকাত, হা/২১৯২।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৪৬; মিশকাত, হা/২১৯১।

১০. ইবনু মাজাহ, হা/১৩৫০; নাসাঈ, হা/১০১০; মিশকাত, হা/১২০৫, সনদ ছহীহ।

১১. আবূ দাঊদ, হা/৯০৪; নাসাঈ, হা/১২১৪; মিশকাত, হা/১০০০, হাদীছটি ছহীহ।

১২. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭২; আবূ দাঊদ, হা/৮১৫; নাসাঈ, হা/১৬৬৪।

১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯২; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/৪৭৩; নাসাঈ, হা/১১৪৯; বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/২৮৬৮।

১৪. নাসাঈ, হা/৩০৮; মিশকাত, হা/২৪৩৩, ২৪৫০।

www.al-itisam.com

দাম্পত্য জীবনের অবক্ষয় ও ইসলামী সমাধান

-আয়াজ আহমাদ*

দাম্পত্য ভাঙন ও পরকীয়ার প্রবণতাকে কোনো একটি কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর পেছনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক নানা প্রভাব একযোগে কাজ করে। আবেগের ঘাটতি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিনের দূরত্ব, প্রবাসজীবনের কারণে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা, বয়স ও চিন্তাধারার পার্থক্য এবং দায়িত্বহীনভাবে গড়ে ওঠা বৈবাহিক সম্পর্ক— এসব কারণ দাম্পত্য বন্ধনকে দুর্বল করে দেয়।

এর পাশাপাশি পারিবারিক চাপ, সামাজিক প্রভাব এবং মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সহজলভ্য যোগাযোগ অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্কের দূরত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ফলস্বরূপ, যে দাম্পত্য সম্পর্ক শান্তি ও প্রশান্তির আশ্রয় হওয়ার কথা, সেখানে সৃষ্টি হয় অস্থিরতা, অসন্তোষ ও শূন্যতা। আর এই বাস্তবতার মধ্যেই বহু পরিবারে ভাঙন এবং গভীর মানসিক ক্ষতের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'ছিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান করো। আর আহার করো এবং পান করো যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত ছিয়াম পূর্ণ করো। আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন, যাতে তারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*।

পোশাকের কাজ হলো মানুষকে আবৃত করা, সুরক্ষা দেওয়া এবং উষ্ণতা প্রদান করা। বিবাহবন্ধনও ঠিক তেমনি। বিবাহ কেবল কাবিননামায় সই করার বিষয় নয়; বরং প্রতিদিনের উপস্থিতি, পারস্পরিক কথোপকথন, স্পর্শ, ভালোবাসা ও যত্নের মধ্য দিয়েই তা জীবন্ত ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে শারীরিক ও মানসিক সান্নিধ্য, একে অপরের জন্য সময় দেওয়া এবং আন্তরিক যত্নের অভাব দেখা দিলে সম্পর্কের ভিত্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইসলামী ফিক্বহে উল্লেখ রয়েছে যে, কোনো স্বামী যদি চার মাসের বেশি সময় স্ত্রীকে একা রেখে দূরে অবস্থান করেন, তবে স্ত্রীর বিচ্ছেদ চাওয়ার অধিকার সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়ে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুমাল্লাহ-এর মতামত সুপরিচিত। আমাদের সমাজে অনেক পুরুষ জীবিকার প্রয়োজনে বছরের পর বছর প্রবাসে থাকেন এবং দেশে ফেরার সুযোগ পান না। ফলে স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি বা নিজ সংসারে একাই সন্তান লালনপালন, পারিবারিক দায়িত্ব পালন এবং নানাবিধ সামাজিক চাপ মোকাবিলা করতে হয়।

তবে দাম্পত্য ভাঙন বা সম্পর্কের সংকটের পেছনে কেবল দীর্ঘ প্রবাসজীবনই দায়ী নয়, আরও নানা কারণ একসঙ্গে কাজ করে। যেমন- অর্থনৈতিক চাপ, বেকারত্ব, জীবিকার অনিশ্চয়তা, দাম্পত্য সম্পর্কে আবেগগত দূরত্ব, পারস্পরিক যোগাযোগের অভাব এবং দীর্ঘ সময় আলাদা থাকার কারণে সম্পর্কের স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা কমে যাওয়া। এসব কারণে অনেক ক্ষেত্রে মানসিক অস্থিরতা ও সামাজিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ, দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন বৃদ্ধি পায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মাঝে সে-ই উত্তম, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চাইতে উত্তম। আর তোমাদের কোনো সঙ্গী মৃত্যুবরণ করলে তার সমালোচনা পরিত্যাগ করো'।[১৬]

১৫* আসাম, ভারত।

১৬. তিরমিযী, হা/৩৮৯৫।

www.al-itisam.com

তাহলে কীভাবে সেই ব্যক্তি উত্তম হতে পারেন, যিনি অনিয়ম ও অবহেলার কারণে ডায়াবেটিসসহ নানা রোগে শরীরকে দুর্বল করে ফেলেছেন; নিজের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেননি; যিনি জীবনের দীর্ঘ সময় সম্পর্কহীনভাবে কাটিয়ে হঠাৎ বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেন; যার মধ্যে দাম্পত্য বোঝাপড়া ও মানসিক পরিপক্বতার ঘাটতি রয়েছে; যিনি ৫০ বছর বয়সে ১৮ বছরের এক তরুণীকে বিয়ে করেন, কিন্তু বয়স, অভিজ্ঞতা ও চাহিদার বিশাল ব্যবধান উপলব্ধি করেন না; যিনি বিবাহকে কেবল ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের মাধ্যম হিসেবে দেখেন; যিনি ভবিষ্যৎ, সন্তান, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার প্রশ্নে বাস্তবসম্মত চিন্তা করেন না এবং যার মধ্যে ত্যাগ, ধৈর্য ও ন্যায়বিচারের ঘাটতি রয়েছে?

উপরিউক্ত হাদীছে মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বোঝাতে চেয়েছেন যে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অর্থে উত্তম, যিনি স্ত্রী, সন্তান ও নিকটজনদের সঙ্গে সদাচরণ করেন, তাদের অধিকার রক্ষা করেন এবং দায়িত্বশীল, সহানুভূতিশীল ও ন্যায়পরায়ণ থাকেন।

এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষ তখনই পূর্ণাঙ্গভাবে ভালো হতে পারেন, যখন তার শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক পরিপক্বতা এবং নৈতিক চরিত্র—তিনটিই সুসংহত থাকে। এদের যেকোনো একটির দুর্বলতা অন্য দুটিকেও প্রভাবিত করে।

প্রথমে শারীরিক প্রস্তুতির প্রসঙ্গ ধরা যাক। মানুষের শরীর একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা, নিয়মিত যত্নের অভাবে তা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। এর প্রভাব শুধু ব্যক্তির ওপর নয়, তার পারিবারিক জীবনেও পড়ে। টাইপ-২ ডায়াবেটিস তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষণা বলছে, ডায়াবেটিক পুরুষদের মধ্যে ইরেক্টাইল ডিসফাংশনের হার সাধারণ পুরুষের তুলনায় তিন গুণ বেশি। এর কারণ হলো ডায়াবেটিস রক্তনালি ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি সৃষ্টি করে, ফলে যৌন কার্যক্ষমতা সরাসরি ব্যাহত হয়। ডায়াবেটিসের সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা ও টেস্টোস্টেরনের ঘাটতি যুক্ত হয়ে সমস্যাকে আরও খারাপ করে তোলে। জার্নাল অব সেক্সুয়াল মেডিসিনে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত পুরুষদের মধ্যে যৌন অক্ষমতার হার ৬৮ শতাংশ পর্যন্ত। আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা স্বাভাবিকভাবেই কমে। আমেরিকান ইউরোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যানুযায়ী, ৪৫ বছরের পর প্রতি বছর প্রায় ১-২ শতাংশ হারে এই হরমোন হ্রাস পায়। ফলে যে ব্যক্তি বছরের পর বছর নিজের শরীরের যত্ন নেননি, পঞ্চাশের পরে তার পক্ষে তরুণী স্ত্রীর চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়া স্বাভাবিক ও পূর্বানুমেয়। ইসলামও এই দায়িত্বকে এড়িয়ে যায়নি। ইসলামও এ দায়িত্বকে গুরুত্ব দিয়েছে। ফিক্বহে 'হাক্কুল ইস্তিমতা' অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শারীরিক সান্নিধ্য ও উপভোগের অধিকারকে বৈবাহিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

তবে শারীরিক প্রস্তুতির ঘাটতির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে মানসিক অপরিপক্বতা। দীর্ঘদিন একাকী জীবনযাপনে অভ্যস্ত একজন ব্যক্তির জন্য দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক সমন্বয় ও দায়িত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কঠিন হতে পারে। মনোবিজ্ঞানী জন বোলবির অ্যাটাচমেন্ট থিওরি অনুযায়ী, মানুষের সম্পর্ক গঠনের ধরন শৈশব থেকে বিকশিত হয় এবং পরবর্তী জীবনে তা আরও দৃঢ় হয়। দীর্ঘ সময় একাকী জীবনযাপন করা কিছু মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে অনীহা বা অস্বস্তি দেখা দিতে পারে। বয়সের সঙ্গে যদি মানসিক অনমনীয়তাও যুক্ত হয়, তাহলে নতুন সম্পর্কের চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

বয়সের ব্যবধানের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের শুরু ও পরিণত পর্যায় দুটি ভিন্ন মানসিক ও সামাজিক বাস্তবতা নির্দেশ করে। মনোবিজ্ঞানী এরিক এরিকসনের মনোসামাজিক বিকাশ তত্ত্ব অনুযায়ী, কৈশোর-পরবর্তী সময়ে মানুষ নিজের পরিচয় ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করে আর মধ্য ও পরবর্তী প্রাপ্তবয়স্ক বয়সে মানুষ অর্জন, দায়িত্ব ও উত্তরাধিকার নিয়ে বেশি মনোযোগী হয়। ফলে দুই প্রজন্মের মানুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠলে তাদের প্রত্যাশা, চিন্তাভাবনা ও জীবনদৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। গবেষণায়ও দেখা গেছে, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান বেশি হলে বৈবাহিক দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

সন্তান ও ভবিষ্যতের প্রশ্নটিও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন তরুণী স্বাভাবিকভাবেই নিরাপদ, স্থিতিশীল ও দীর্ঘমেয়াদি পারিবারিক ভবিষ্যৎ কামনা করতে পারেন। অন্যদিকে অধিক বয়সে পিতৃত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে সন্তানের লালনপালন, দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি এবং শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে বাস্তব প্রশ্ন

তৈরি হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় অধিক পিতৃবয়সের সঙ্গে কিছু স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির সম্ভাব্য সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বিবাহের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শুধু বর্তমানের আবেগ নয়, ভবিষ্যতের দায়িত্ব, সন্তান এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতার বিষয়গুলোও গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সবশেষে আসে ত্যাগ, ধৈর্য ও ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। মনোবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল গোলেম্যান তাঁর বিখ্যাত ‘ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স’ গ্রন্থে বলেছেন, একজন মানুষের সাফল্য ও সম্পর্কের গুণমান তার IQ (Intelligence Quotient)-এর চেয়ে EQ (Emotional Quotient)-এর উপর বেশি নির্ভর করে অর্থাৎ আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার উপর। উল্লেখ্য, IQ হলো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার পরিমাপ, যার মাধ্যমে জানা যায় সে কতটা যুক্তি, বিশ্লেষণ ও শেখার দক্ষতা রাখে। আর EQ হলো আবেগ ও সম্পর্ক বোঝা ও সামলানোর ক্ষমতা এবং নিজের ও অন্যের অনুভূতি বুঝে সঠিকভাবে আচরণ করার দক্ষতা। সফল জীবনে দুটোরই প্রয়োজন থাকলেও সামাজিক ও দাম্পত্য জীবনে EQ অনেক সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার মূল উপাদান হলো সহমর্মিতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং অপরের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবার ক্ষমতা। যে পুরুষ বিয়েকে চাহিদা পূরণের মাধ্যমই মনে করেন এবং স্ত্রীর স্বপ্ন, ভয় ও প্রত্যাশার কথা ভাবেন না, তার আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা যে অপরিপক্ব এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বাণী, ‘তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম...’-এই কথার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাহ্যিক আচরণের পাশাপাশি শরীর, মন ও নৈতিকতাকে একসাথে সক্রিয় রাখার গভীর দায়িত্ববোধের কথাও বুঝিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম ম্যাসলোর চাহিদার সোপান তত্ত্বে শারীরিক চাহিদা নিচে থাকলেও এটিই মানুষের মৌলিক ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রয়োজন। দীর্ঘদিন প্রাথমিক চাহিদা অপূর্ণ থাকলে মানুষের মনে এক ধরনের মানসিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। আবেগীয় সংযোগ, বোঝাপড়া ও ঘনিষ্ঠতার অভাবজনিত মানসিক শূন্যতা পূরণের চেষ্টা ভুল হতে পারে, কিন্তু এর পেছনে থাকে স্বাভাবিক মানবিক কারণ। তবে এমন আচরণকে অনুমোদন করার সুযোগ নেই, বরং এর পেছনের কারণ গভীরভাবে বোঝা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিপথগামিতাকে কখনও যুক্তিসংগত করা যায় না। ইসলামে ব্যভিচার কাবীরা গুনাহ এবং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আর তোমরা যেনা-ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, তা হচ্ছে অশ্লীল কাজ আর অতি জঘন্য পথ’ *(আল-ইসরা, ১৭/৩২)*।

সুতরাং যে নারী পরকীয়ায় জড়ায়, তার পাপ তার নিজের। স্বামীর ব্যর্থতা বা অবহেলা সেই পাপের বৈধতা বা কৈফিয়ত হতে পারে না। তবে সমাজ হিসেবে আমাদের বুঝতে হবে, কোন পরিস্থিতিগুলো মানুষকে এ ধরনের পাপের দিকে ধাবিত করে বা সেই পথকে সহজ করে দেয়।

এ ক্ষেত্রে বয়সের বিশাল ব্যবধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন পুরুষের সঙ্গে আঠারো বছরের এক তরুণীর বিবাহ বা সম্পর্ক অনেক সময় পারস্পরিকতার চেয়ে অসমতার দিকে বেশি ঝোঁকে। মেয়েটি হয়তো দারিদ্র্য থেকে মুক্তির আশায় বিবাহে সম্মত হয়েছে, আবার পরিবারও অর্থনৈতিক বা সামাজিক সুবিধার প্রত্যাশায় এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে। কিন্তু একটি সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য যে স্বাভাবিক মানসিক, আবেগিক ও জীবনগত সামঞ্জস্য প্রয়োজন, তা অনেক ক্ষেত্রে শুরু থেকেই অনুপস্থিত থাকে।

মনোবিজ্ঞানী জন গটম্যান তার দীর্ঘ গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, সফল দাম্পত্য সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি হলো Emotional Attunement বা গভীর আবেগিক সংযোগ। অর্থাৎ একে অপরের অনুভূতি, চাহিদা ও মানসিক অবস্থার প্রতি সংবেদনশীল থাকা এবং সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা। কিন্তু বয়সের বড় ব্যবধানের কারণে স্বামী-স্ত্রীর অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা, জীবনদৃষ্টি ও আবেগের জগতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য তৈরি হতে পারে। ফলে সেই আবেগিক সংযোগ গড়ে তোলা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। আর দীর্ঘ সময় আলাদা থাকা বা প্রবাসজীবনের কারণে এই সংযোগ বজায় রাখা আরও কঠিন হয়ে যায়।

ফলস্বরূপ, সম্পর্কের মধ্যে একাকিত্ব, অপূর্ণতা ও মানসিক দূরত্ব তৈরি হতে পারে। যদিও এসব পরিস্থিতি কোনো অনৈতিক সম্পর্ক বা পরকীয়ার নৈতিক দায়কে লঘু করে না, তবুও এগুলো এমন কিছু বাস্তব কারণ, যা সম্পর্কের দুর্বলতা ও ভাঙনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।

ইসলামে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য কী? সূরা আর-রূমে আল্লাহ বলেছেন, ‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।

নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে’ (আর-রূম, ৩০/২১)। এই আয়াতে তিনটি শব্দ গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ—প্রশান্তি, ভালোবাসা ও দয়া। প্রশান্তি তখনই আসে, যখন দুজন মানুষ একে অপরের পাশে থাকে; ভালোবাসা তখনই টিকে থাকে, যখন সম্পর্কে নিয়মিত বিনিয়োগ হয় এবং দয়া তখনই প্রকাশ পায়, যখন একজন আরেকজনের দুর্বলতাকে সম্মান করে। কিন্তু মানসিক দূরত্ব, দায়িত্বহীনতা, আবেগীয় সংযোগের অভাব, বয়স ও অভিজ্ঞতার বড় ব্যবধান, স্বার্থকেন্দ্রিক মনোভাব এবং দীর্ঘ অনুপস্থিতির মতো বাস্তবতা এই তিনটি গুণের বিকাশকে গভীরভাবে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে এমন পরিস্থিতিতে এগুলো স্বাভাবিকভাবে পূর্ণতা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, দীর্ঘদিনের দূরত্ব সম্পর্ককে এমনভাবে দুর্বল করে যে, তা পুনরুদ্ধারে অনেক সময় প্রয়োজন হয়।

পারিবারিক ভাঙনের কারণ হিসেবে স্বামীর অনুপস্থিতিকেই দায়ী করা বিপজ্জনক সরলীকরণ। এই যুক্তি মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে, মানুষের নৈতিক অবস্থান পরিস্থিতির দাস অর্থাৎ পাশে কেউ না থাকলে মানুষ বিপথে যাবেই, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজ পর্যবেক্ষণে বুঝা যায়, প্রবাসী পরিবার ছাড়াও একই ছাদের নিচে থাকা দম্পতিদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতকতা ঘটে। শহরের মধ্যবিত্ত পরিবার, গ্রামের কৃষকের সংসার, এমনকি ধর্মীয় পরিচয়ে পরিচিত পরিবারেও সম্পর্কের ফাটল দেখা দেয়। তাহলে প্রশ্ন জাগে, দূরত্ব যদি কারণ না হয়; তবে আসল কারণ কী? উত্তর একটাই, মূল্যবোধের ক্ষয়, দায়িত্ববোধের অনুপস্থিতি এবং সমাজের সামগ্রিক নৈতিক অবক্ষয়।

এই অবক্ষয়ের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সামাজিক প্রক্রিয়া। পরিবার প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্বল হয়েছে, কারণ সমাজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্পর্কের উপরে স্থান দিতে শিখেছে। প্রযুক্তি মানুষকে কাছে আনার বদলে অনেক ক্ষেত্রে বিচ্যুতির নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। বিনোদনমাধ্যম সম্পর্কের গভীরতার চেয়ে উত্তেজনাকে মহিমান্বিত করেছে। শিক্ষাব্যবস্থা নৈতিক শিক্ষাকে পাঠ্যক্রম থেকে কার্যত বিদায় দিয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসন সামাজিক চাপ থেকে ব্যক্তি-পছন্দের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো একসাথে এমন এক সমাজ তৈরি করেছে, যেখানে প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেয়ে ব্যক্তিগত সুখের অনুসন্ধানকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইসলামী ফিক্বহ বিয়ের ক্ষেত্রে কুফূর কথা বলেছে অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য। বয়স, শিক্ষা ও মানসিকতা ইত্যাদিতে সাযুজ্য থাকা উচিত।

পারস্পরিক দায়িত্ব ও বোঝাপড়ার অভাবই দাম্পত্য ভাঙনের মূল কারণ, যার মধ্যে স্বামীর অবহেলা, স্ত্রীর বিচ্যুতি, পরিবারের স্বার্থপর আচরণ ও সমাজের নীরবতা অন্তর্ভুক্ত। তবে সংসারের স্থিতি রক্ষার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের উপরই বর্তায়। কারণ পুরুষই দাম্পত্য সম্পর্কের উদ্যোক্তা, অভিভাবক ও কর্তা। নিজ হাতে গড়া বাগানের পরিচর্যার দায়িত্ব অন্য কারও নয়। যে মালি বাগানে আসা বন্ধ করে দেয়, সে আগাছার জন্য অন্যকে দোষ দেওয়ার অধিকার হারায়।

তাই পুরুষদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট আহ্বান, শরীরের প্রতি যত্নশীল হোন (অসুস্থ, বার্ধক্যক্লিষ্ট বা উদাসীন শরীর দিয়ে দাম্পত্যের পূর্ণ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়), বয়সের বাস্তবতা মাথায় রেখে বিবাহের সিদ্ধান্ত নিন (তরুণী স্ত্রীর চাহিদা, স্বপ্ন ও প্রয়োজন বোঝার সক্ষমতা আপনার আছে কি-না, সেটি আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন)। পরিবার অর্থের ভিত্তিতে স্থায়ী হয় না; স্থায়ী হয় উপস্থিতি, মনোযোগ ও ভালোবাসার ধারাবাহিক অনুশীলনে। এই সত্য পনেরো শত বছর আগেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট করেছেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেওয়ার জন্য; তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন’ *(আন-নিসা, ৪/১৯)*।

আয়াতটি আর্থিক দায়িত্বের পাশাপাশি সময় দেওয়া, সম্মান বজায় রাখা এবং স্ত্রীর মানবিক মর্যাদা রক্ষার নির্দেশনা দেয়। যে পুরুষ এই দায়িত্ব পালন করেন, তার সংসার স্বাভাবিকভাবে শৃঙ্খলিত ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সবাইকে সরল, পবিত্র ও দায়িত্বশীল ইসলামী দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য অনুধাবন করার এবং সেই জীবন বাস্তবে উপভোগ করার তাওফীক্ব দান করেন, যেখানে পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা, ধৈর্য ও সচেতন দায়িত্ববোধের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল পরিবার গড়ে ওঠে- আমীন!

যেনার দণ্ডবিধি (শাস্তি)*

মূল: ড. আব্দুল আযীম আল-বাদাবী
অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন**

যেনা বা ব্যভিচার হারাম এবং এটি সবচেয়ে বড় গুনাহের একটি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(আল-ইসরা, ১৭/৩২)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَعْظَمُ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, 'কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার সন্তানকে এ আশঙ্কায় হত্যা করা যে, তারা তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে'। আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, 'এরপর হচ্ছে তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা'।[১৯] আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন, ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا - يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا - إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ 'তারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না। আর যথার্থতা ব্যতীত কোনো প্রাণ হত্যা করে না, যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন আর তারা ব্যভিচার করে না। আর যে এগুলো করে সে শাস্তির মুখোমুখি হবে। ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে আর সে সেখানে লাঞ্ছিত হয়ে চিরবাস করবে। তবে তারা নয়; যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে আর সৎকাজ করবে। আল্লাহ এদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন; আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৬৮-৭০)*।

আর সামুরা ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দেখা স্বপ্নের বর্ণনায় (এ কথাটি এসেছে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ؟...... قَالَا هُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي.

'আমরা চললাম এবং চুলার মতো একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম'। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় যেন তিনি বলেছিলেন, 'আর সেখানে শোরগোলের শব্দ ছিল'। তিনি বলেন, 'আমরা তাতে উঁকি মারলাম, দেখলাম তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। আর নিচ থেকে বের হওয়া আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠে'। তিনি বলেন, 'আমি তাদেরকে বললাম, এরা কারা? ...তিনি বললেন, (আর এ সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা চুলা সদৃশ গর্তের ভিতর আছে) তারা হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল'।[২০] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

১৭* শায়খ আব্দুল আযীম বাদাবী প্রণীত 'আল-ওয়াজীয ফী ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযীয' বই থেকে সংগৃহীত।

১৮**প্রিন্সিপ্যাল, দারুস সালাম ইসলামী কমপ্লেক্স, পিরুজালী ময়তাপাড়া, গাজীপুর।

১৯. (حَلِيلَةِ جَارِكَ) বলতে প্রতিবেশীর সেই নারীকে বোঝানো হয়, যার সঙ্গে তার জন্য সহবাস বৈধ। আরেক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সে নারী, যে তার সঙ্গে একই বিছানায় বৈধভাবে অবস্থান করতে পারে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৭৬১, ৬৮১১, 'শব্দবিন্যাস তাঁরই'; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৬; আবূ দাঊদ, হা/২৩১০; তিরমিযী, হা/৩১৮৩; মিশকাত, হা/৪৯)।

২০. ছহীহুল জামে', হা/৩৪৬২; ছহীহ বুখারী, হা/৭০৪৭, 'শব্দবিন্যাস তাঁরই'।

‘মুমিন থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। মুমিন থাকা অবস্থায় কোনো চোর চুরি করে না। মুমিন থাকা অবস্থায় কেউ মদ্যপান করে না। মুমিন থাকা অবস্থায় কেউ হত্যা করে না’। ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-কে জিজ্ঞেস করলাম, তার থেকে ঈমান কীভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়? তিনি বললেন, এভাবে আর আঙুলগুলো পরস্পর জড়ালেন, এরপর অঙ্গুলিগুলো বের করলেন। যদি সে তওবা করে তবে পূর্বের অবস্থায় এভাবে ফিরে আসে। এ বলে অঙ্গুলিগুলো আবার পরস্পর জড়ালেন।[২১]

যেনার (ব্যভিচারের) প্রকারভেদ:

ব্যভিচারী হয় বিবাহিত অথবা অবিবাহিত। সুতরাং যদি কোনো স্বাধীন, মুহছান (বিবাহিত), প্রাপ্তবয়স্ক ও শরীআত-দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করে[২২]; তাহলে তার জন্য নির্ধারিত হদ্দ (শরীআতসম্মত শাস্তি) হলো পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (রজম), যতক্ষণ না সে মারা যায়। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আনছারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল। এসে বলল, সে যেনা করেছে এবং নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিল। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে আদেশ দিলেন, অতঃপর তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। সে ছিল বিবাহিত।[২৩]

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, একদা উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন,

إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাযিল করেছেন। আর তাঁর উপর যা নাযিল করা হয়েছিল, তার মধ্যে রজমের আয়াতও ছিল। আমরা তা পাঠ করেছি, সংরক্ষণ করেছি এবং ভালোভাবে বুঝে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজে রজমের শাস্তি কার্যকর করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও তা কার্যকর করেছি। আমি আশঙ্কা করি, মানুষের উপর যদি দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়, তবে কেউ একজন বলবে, وَاللهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ ‘আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাবে তো আমরা রজমের বিধান খুঁজে পাই না। ফলে তারা আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত একটি ফরয বিধান পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহর কিতাবে রজমের বিধান সত্য অবধারিত সেসব পুরুষ ও নারীর জন্য, যারা বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করে। যখন (অপরাধ প্রমাণের জন্য) সুস্পষ্ট সাক্ষ্য থাকে অথবা গর্ভধারণ প্রমাণিত হয় অথবা অপরাধী নিজে স্বীকারোক্তি প্রদান করে’।[২৪]

দাস (ক্রীতদাস/ক্রীতদাসী)-এর জন্য নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ):

যদি স্বাধীন নয় এমন ব্যক্তি (সে দাস হোক বা দাসী) যেনা করে, তবে তার উপর রজমের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না; বরং তাকে ৫০টি বেত্রাঘাত করা হবে। আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ ‘অতঃপর যখন তারা বিবাহিত হবে, তখন যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়; তাহলে তাদের উপর স্বাধীন নারীর অর্ধেক আযাব হবে। এটা তাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারের ভয় করে’ *(আন-নিসা, ৪/২৫)*।

---

২১. ছহীহুল জামে‘, হা/৭৭০৮; ছহীহ বুখারী, হা/৬৮০৯, ‘শব্দবিন্যাস তাঁরই’; নাসাঈ, হা/৪৮৬৯; মিশকাত, হা/৫৪।

২২. المحصن (মুহছান): সে ব্যক্তি, যার পূর্বে শরীআতসম্মত সঠিক বিবাহের মাধ্যমে সহবাস সম্পন্ন হয়েছে। আর المكلف ‘মুকাল্লাফ’ হলো, যে ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন। অতএব, শিশু ও পাগলের উপর কোনো হদ্দ (শাস্তি) প্রযোজ্য নয়; কেননা হাদীছে এসেছে, رفع القلم عن ثلاثة ‘তিন শ্রেণির ব্যক্তি থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে’—এ হাদীছটি পূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

২৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৮১৪, ‘শব্দবিন্যাস তাঁরই’। উল্লেখ্য যে, লেখক উক্ত হাদীছে আবূ দাঊদ ও তিরমিযীর কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু উক্ত শব্দে সেখানে পাইনি। -অনুবাদক

২৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৯১; আবূ দাঊদ, হা/৪৪১৮; তিরমিযী, হা/১৪৩২; নাসাঈ কুবরা, হা/৭১২১, ‘শব্দবিন্যাস তাঁরই’; মিশকাত, হা/৩৫৫৭।

আব্দুল্লাহ ইবনু আইয়্যাশ আল-মাখযূমী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে কুরাইশ বংশের কয়েকজন যুবকের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর আমরা সরকারি কোষাগারের তথা বায়তুল মালের কয়েকজন দাসীকে ৫০টি করে বেত্রাঘাত করেছিলাম যেনার অপরাধের কারণে।[২৫]

যাকে জোরপূর্বক যেনায় লিপ্ত করা হয়েছে, তার উপর কোনো হদ্দ (শাস্তি) প্রযোজ্য নয়:

আবূ আব্দুর রহমান আস-সুলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ أَرَى أَنْ تُخَلِّيَ سَبِيلَهَا فَفَعَلَ উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট এক নারীকে আনা হলো, যাকে তীব্র তৃষ্ণা চরমভাবে কষ্ট দিচ্ছিল। সে পথে এক রাখালের কাছে গিয়েছিল এবং তার কাছে পানি চেয়েছিল; কিন্তু সে রাখাল পানি দিতে অস্বীকার করল, যতক্ষণ না সে তার সঙ্গে নিজের শরীর সমর্পণ করতে রাজি হয়। অতঃপর সে তাই করেছিল (চরম বাধ্যবাধকতার কারণে)। এরপর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ব্যাপারে রজমের শাস্তি কার্যকর করা হবে কি-না সে বিষয়ে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই নারীটি ছিল চরমভাবে বাধ্য (মযবূর)। আমার পরমর্শ হলো, আমরা তাকে মুক্ত করে দিব। অতঃপর তিনি (উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাই করলেন।[২৬]

অবিবাহিত ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ):

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ '(অবিবাহিত) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী প্রত্যেককে তোমরা ১০০ বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর এই বিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি কোনোরূপ দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের এই শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' *(আন-নূর, ২৪/২)*। যায়দ ইবনু খালেদ আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আদেশ দিতে শুনেছি, ওই ব্যক্তি সম্পর্কে ১০০ বেত্রাঘাত করার ও এক বছরের জন্য নির্বাসনের, যে অবিবাহিত অবস্থায় যেনা করেছে'।[২৭] উবাদা ইবনু ছামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ 'তোমরা আমার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, তোমরা আমার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মহিলাদের জন্য একটি পন্থা বের করেছেন। যদি কোনো অবিবাহিত পুরুষ কোনো কুমারী মেয়ের সাথে ব্যভিচার করে, তবে ১০০ বেত্রাঘাত করো এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর যদি বিবাহিত ব্যক্তি কোনো বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করে; তবে তাদের প্রথমে ১০০ বেত্রাঘাত করবে, এরপর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে'।[২৮]

(ইনশা-আল্লাহ! আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

২৫. ইরওয়াউল গালীল, হা/২৩৪৫; মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/১৬ (আব্দুল বাক্বী); বায়হাক্বী, হা/১৭০৮৯, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।
২৬. ইরওয়াউল গালীল, হা/২৩১৩; বায়হাক্বী, হা/১৭০৫০, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
২৭. ইরওয়াউল গালীল, হা/২৩৪৭; ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৩১; মিশকাত, হা/৩৫৫৬, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
২৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৯০; আবূ দাঊদ, হা/৪৪১৬; তিরমিযী, হা/১৪৩৪, ১৪৫১; ইবনু মাজাহ, হা/২৫৫০; মিশকাত, হা/৩৫৫৮, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

কুরআন তেলাওয়াতের আদব-এর বাকি অংশ

এ হলো কুরআন তেলাওয়াতের কতিপয় আদব। সুতরাং হে পাঠকবৃন্দ! এসব আদবের প্রতি যথাযথ লক্ষ রেখে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করুন এবং আল্লাহর মেহেরবানী ও করুণা অন্বেষণ করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সেভাবে কুরআন তেলাওয়াতের তাওফীক্ব দিন, যেভাবে তেলাওয়াত করলে আপনি খুশি হবেন। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আপনি আমাদের শান্তির পথ দেখান, এর দ্বারা আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় বের করে আনুন এবং একে আমাদের আমাদের পক্ষে দলীল বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনার আপন করুণায় এ কুরআনের মাধ্যমে জান্নাতে আমাদের উঁচু স্তর প্রদান করুন এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দিন। আমাদের যাবতীয় গুনাহের ক্ষতিপূরণ করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার সম্মানিত বস্তুগুলোকে সম্মান করার, আপনার দানগুলো আহরণ করে সফলতা লাভ করার এবং আপনার জান্নাতসমূহের ওয়ারিছ হওয়ার তাওফীক্ব দিন। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতাকে ও সকল মুসলিমকে স্বীয় রহমতে ক্ষমা করুন- আমীন!

সফল জীবনের তিন অমূল্য সম্পদ

-আব্দুল গাফফার মাদানী*

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার নিমিত্তে, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার পথ দেখিয়েছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি, যিনি তাঁর উম্মতকে এমন সব অমূল্য সম্পদের সন্ধান দিয়েছেন, যা অর্জন করলে মানুষ প্রকৃত অর্থেই সফল, সৌভাগ্যবান ও কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

পরকথা হলো, মানুষের জীবনে প্রকৃত সফলতা কেবল ধনসম্পদ, পদ-পদবি বা পার্থিব প্রাচুর্যের নাম নয়; বরং সফলতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে দুনিয়ায় শান্তিময় জীবন এবং আখেরাতে চিরস্থায়ী মুক্তি লাভ করা।

আজকের পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ সম্পদ বলতে অর্থ, বাড়ি, গাড়ি কিংবা ক্ষমতাকেই বোঝে। অথচ এসব সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, সময়ের পালাবদলে এগুলো হারিয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের এমন কিছু সম্পদের কথা শিক্ষা দিয়েছেন, যা কখনো মূল্যহীন হয় না, কখনো পুরোনো হয় না এবং যার সুফল দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এগুলোই মানুষের প্রকৃত সম্পদ, প্রকৃত সৌভাগ্য এবং চিরস্থায়ী সফলতার মূলধন।

সুধী পাঠক! আসুন, আমরা নিচের হাদীছটি একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ি এবং হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। এটি কোনো মনীষীর উক্তি, দার্শনিকের চিন্তা কিংবা কাল্পনিক গল্প নয়; বরং মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর অমূল্য উপদেশ। তিনি দ্বীনের বিষয়ে নিজের প্রবৃত্তি থেকে কথা বলতেন না, আল্লাহ তাআলার অহীর নির্দেশনায় কথা বলতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, - ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ 'তিনি নিজের প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। কেবল তা অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়' *(আন-নাজম, ৫৩/৩–৪)*।

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ.

ছাওবান রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহর এই বাণী নাযিল হলো, 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে…' *(আত-তাওবা, ৯/৩৪)*, তখন ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কোন সম্পদ সঞ্চয় করব? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের প্রত্যেকে যেন একটি কৃতজ্ঞ হৃদয়, আল্লাহর যিকিরে সদা ব্যস্ত একটি জিহ্বা এবং এমন একজন মুমিনা স্ত্রী গ্রহণ করে, যে তাকে আখেরাতের কাজে সহযোগিতা করবে'।[৩০]

এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনটি সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন, যা স্বর্ণ-রৌপ্য, অট্টালিকা কিংবা পার্থিব অন্যান্য ধনসম্পদের চেয়েও মূল্যবান। যে ব্যক্তি এই তিনটি সম্পদের অধিকারী হয়, সে প্রকৃতার্থেই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

এই হাদীছের পটভূমি অত্যন্ত শিক্ষণীয়। সূরা আত-তাওবার ৩৪ নম্বর আয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে আল্লাহর পথে ব্যয় না করার কঠোর সতর্কবাণী নাযিল হলো। ছাহাবায়ে কেরাম চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাদের প্রশ্ন ছিল, যদি স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করা নিন্দনীয় হয়, তবে একজন মুমিনের জন্য সর্বোত্তম সম্পদ কী হতে পারে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশ্নের উত্তরে এমন তিনটি সম্পদের কথা উল্লেখ করলেন, যেগুলো কখনো নষ্ট হয় না, চুরি হয় না, যাকাত দেওয়ার পর কমে যায় না; বরং মানুষকে দুনিয়ায় শান্তি এবং আখেরাতে মুক্তি এনে দেয়। এ থেকেই বুঝা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত সম্পদ মানে অর্থসম্পদ নয়; বরং যা মানুষের ঈমান, আমল ও আখেরাতকে সমৃদ্ধ করে, সেটিই প্রকৃত ও সর্বোত্তম সম্পদ।

(১) কৃতজ্ঞ হৃদয়: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম যে সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো 'কৃতজ্ঞ হৃদয়'। কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া শুধু মুখে মুখে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলার নাম নয়; বরং এটি অন্তরের এমন অবস্থা, যেখানে বান্দা সর্বদা আল্লাহর নেয়ামতকে স্বীকার করে, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং প্রতিটি নেয়ামতকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করার চেষ্টা করে। কুরআন মাজীদে এসেছে, ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ 'তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরও বৃদ্ধি করে দেব' *(ইবরাহীম, ১৪/৭)*।

২৯* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৩০. তিরমিযী, হা/৩০৯৪; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৫৬, হাদীছ ছহীহ।

এ আয়াতে আমরা দেখতে পাই, কৃতজ্ঞতা শুধু একটি নৈতিক গুণ নয়; বরং এটি আল্লাহর নেয়ামত বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কৃতজ্ঞতা বা শোকরের মূল হলো অন্তরে নেয়ামতদাতাকে স্বীকার করা, মুখে তাঁর প্রশংসা করা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত করা। অতএব, 'কৃতজ্ঞ হৃদয়' এমন হৃদয়, যা নেয়ামতের জন্য অহংকার করে না, বিপদে আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্ট হয় না এবং সুখে আল্লাহকে ভুলে যায় না; বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। এমন হৃদয়ই প্রকৃত সম্পদ। কারণ ধনসম্পদ হারিয়ে যেতে পারে; কিন্তু কৃতজ্ঞ হৃদয় মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে, ঈমানকে সুদৃঢ় করে এবং তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের পথে পরিচালিত করে।

(২) **যিকিরকারী জিহ্বা:** কৃতজ্ঞ হৃদয়ের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো 'যিকিরকারী জিহ্বা'। এটি এমন এক অমূল্য সম্পদ, যা কোনো অর্থ দিয়ে কেনা যায় না; কিন্তু এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি, অন্তরের প্রশান্তি এবং আখেরাতের মুক্তি অর্জন করতে পারে। যিকির অর্থ শুধু সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলা নয়; বরং আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর আদেশ মানা, নিষেধ থেকে বিরত থাকা, কুরআন তেলাওয়াত করা এবং দু'আ, ইস্তিগফার, তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ এসবই যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا - وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো' *(আল আহযাব, ৩৩/৪১-৪২)*।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ 'জেনে রেখো! আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে' *(আর-রা'দ, ১৩/২৮)*।

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃত মানসিক প্রশান্তি ধনসম্পদ, ক্ষমতা বা খ্যাতিতে নয়; বরং আল্লাহর স্মরণে নিহিত। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ 'যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে এবং যে যিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়'।[৩১]

এই হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন যে, যিকির মানুষের হৃদয়কে জীবন্ত রাখে। যিকিরহীন হৃদয় ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে যায় এবং আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। আরেক হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى.

'আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম কাজের সন্ধান দেব না, যা তোমাদের রবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা সবার চেয়ে বেশি বৃদ্ধিকারী, সোনা-রূপা দান করার চেয়েও উত্তম এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়ে গর্দান কাটা ও কাটানোর চেয়ে শ্রেয়?' ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলার যিকির'।[৩২]

ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যিকির হৃদয়ের প্রাণ এবং তার খাদ্য ও শক্তি। হৃদয় যিকির থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তা এমন দুর্বল হয়ে পড়ে, যেমন পানি থেকে বিচ্ছিন্ন মাছ দুর্বল হয়ে পড়ে।[৩৩]

যিকির এমন একটি ইবাদত, যার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। বান্দা যত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে, ততই সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। কেননা যিকির হলো ঈমানের প্রাণ। যে হৃদয় যিকিরে সজীব থাকে, সে হৃদয়ে শয়তানের প্রভাব দুর্বল হয়ে যায়।

যিকিরকারী জিহ্বার বৈশিষ্ট্য: একজন মুমিনের জিহ্বা সর্বদা আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকে। মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরি ও অশ্লীল ভাষা থেকে বিরত থাকে। কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হয়। অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করে। মানুষের সঙ্গে উত্তম ভাষায় কথা বলে। এমন জিহ্বাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায় প্রকৃত সম্পদ।

এখানে অনুধাবনীয় বিষয়: ১. যিকির মানুষের হৃদয়কে জীবন্ত রাখে। ২. আল্লাহর স্মরণই প্রকৃত প্রশান্তির উৎস। ৩. যে জিহ্বা যিকিরে ব্যস্ত থাকে, তা সাধারণত গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকে। ৪. যিকির দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই সফলতার অন্যতম মাধ্যম। ৫. একজন মুসলিমের প্রতিদিনের জীবন তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর, তাহলীল, ইস্তিগফার ও কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া উচিত।

(৩) **মুমিনা স্ত্রী:** রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই হাদীছে তিনটি সর্বোত্তম সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম দুটি হলো কৃতজ্ঞ হৃদয় ও যিকিরকারী জিহ্বা। এরপর তিনি তৃতীয় যে সম্পদের কথা বলেছেন, তা হলো وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ 'আর এমন একজন মুমিনা স্ত্রী, যে স্বামীকে ঈমানের কাজে সহযোগিতা করে'।[৩৪]

---

৩১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪০৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৯।

৩২. তিরমিযী, হা/৩৩৭৭; ইবনু মাজাহ, হা/৩৭৯০; আহমাদ, হা/২১১৯৫, ২৬৯৭৭, হাদীছ ছহীহ।

৩৩. আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব মিন কালিমিত তাইয়িব, পৃ. ৪২-৪৩।

৩৪. তিরমিযী, হা/৩০৯৪; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৫৬।

এখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু ‘মুমিনা স্ত্রী’ বলেননি; বরং বলেছেন, ‘যে ঈমানের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে’। অর্থাৎ স্ত্রীর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ শুধু তার ঈমান নয়; বরং সেই ঈমানের বাস্তব প্রকাশ, যা স্বামীকে আল্লাহর আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করে। কেন নেককার স্ত্রীকে ‘উত্তম সম্পদ’ বলা হয়েছে? মানুষ সাধারণত সম্পদ বলতে অর্থ, স্বর্ণ, জমি, ব্যবসা কিংবা বাড়িঘরকে বুঝে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিলেন, প্রকৃত সম্পদ এমন কিছু, যা মানুষের ঈমান, চরিত্র ও আখেরাতকে সমৃদ্ধ করে। তাই অন্য একটি হাদীছে তিনি বলেন, الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ‘দুনিয়া ভোগের সামগ্রী। আর দুনিয়ার সর্বোত্তম ভোগ্যসম্পদ হলো নেককার স্ত্রী’।[৩৫]

এখানে ‘ভোগ্যসম্পদ’ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ নেককার স্ত্রী এমন এক নেয়ামত, যা মানুষকে শুধু দুনিয়ার শান্তিই দেয় না; বরং আখেরাতে সফলতারও মাধ্যম হয়। কুরআনের আলোকে নেককার স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ ‘আর নেককার নারীরা অনুগত থাকে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে সংরক্ষিত রাখে, যেভাবে আল্লাহ সংরক্ষিত রেখেছেন’ *(আন-নিসা, ৪/৩৪)*।

এই আয়াতে আল্লাহ নেককার স্ত্রীর দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, ১. তিনি আল্লাহর আনুগত্যশীল এবং ২. তিনি স্বামীর অনুপস্থিতিতেও বিশ্বস্ত ও আমানতদার। এগুলোই একটি সুখী মুসলিম পরিবারের ভিত্তি। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের সর্বপ্রথম মানদণ্ড। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ‘চারটি কারণে নারীকে বিবাহ করা হয়; তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও দ্বীনের জন্য। অতএব, তুমি দ্বীনদার নারীকে প্রাধান্য দাও; নচেৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে’।[৩৬]

এই হাদীছের অর্থ এই নয় যে, সৌন্দর্য, বংশ বা সম্পদের কোনো মূল্য নেই। বরং এগুলোর মধ্যে দ্বীনদারিতা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, যা স্বামীর জন্য জান্নাতের পথে সহায়ক হবে। নেককার স্ত্রী এমন একজন, যিনি— ১. স্বামীকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামাআতের সাথে পড়ার জন্য উৎসাহিত করেন। ২. তাহাজ্জুদ, কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরে সহযোগিতা করেন। ৩. হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করেন। ৪. সন্তানদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলেন। ৫. পরিবারে তাক্বওয়া ও সুন্নাহর পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

একারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ‘সুন্দরী স্ত্রী’ বা ‘ধনী স্ত্রী’ বলেননি। তিনি বলেছেন, تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ ‘যে তাকে আখেরাতের কাজে সহযোগিতা করে’। এই একটি বাক্যই ইসলামে আদর্শ দাম্পত্য জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলাম শুধু দ্বীনদার স্ত্রী নির্বাচন করতে বলেনি, বরং একজন আদর্শ স্ত্রীর বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ ‘কোন নারী সর্বোত্তম?’ তিনি উত্তরে বলেন, الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ ‘সে নারী, যাকে দেখলে স্বামী আনন্দিত হয়, স্বামী কোনো বৈধ নির্দেশ দিলে তা পালন করে এবং নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে এমন কিছু করে না, যা স্বামী অপছন্দ করে’।[৩৭]

এই হাদীছ আমাদের শেখায় যে, একজন উত্তম স্ত্রীর সৌন্দর্য কেবল বাহ্যিক রূপে নয়; বরং তার ঈমান, চরিত্র, আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ও উত্তম ব্যবহারে। নেককার স্ত্রী স্বামীর জন্য আল্লাহর সর্বোত্তম নেয়ামত। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিবর্তে এমন তিনটি সম্পদের কথা বলেছেন, যা মানুষের দ্বীনকে সংরক্ষণ করে এবং আখেরাতের সফলতার কারণ হয়। আর নেককার স্ত্রীকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সংসারজীবনে তিনিই স্বামীর দ্বীনদারিতার সবচেয়ে বড় সহযোগী হতে পারেন।

অনেক মানুষ মনে করেন, বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু পারিবারিক জীবন, সন্তান বা দুনিয়াবী সুখ। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, একজন মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত পরস্পরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথে সহযোগিতা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ ‘তোমরা সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করো’ *(আল-মায়েদা, ৫/২)*।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি— ১. প্রকৃত সম্পদ হলো ঈমান, যিকির ও নেককার পরিবার। ২. কৃতজ্ঞতা আল্লাহর নেয়ামত বৃদ্ধি করে এবং বান্দাকে বিনয়ী রাখে। ৩. যিকির মানুষের হৃদয়কে জীবন্ত রাখে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে। ৪. জীবনসঙ্গী নির্বাচনে দ্বীনদারিতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। ৫. একজন নেককার স্ত্রী স্বামীর দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনের সফলতার অন্যতম মাধ্যম। ৬. মুসলিম পরিবার গড়ে ওঠে পারস্পরিক তাক্বওয়া, দয়া, ভালোবাসা ও আল্লাহর আনুগত্যের উপর।

৩৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৭।

৩৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৬।

৩৭. নাসাঈ, হা/৩২৩১; আহমাদ, হা/৭৪২১; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৭৮৬; সিলসিলা ছহীহা, হা/৮৩৩৮; ছহীহ আল-জামে‘, হা/৩২৯৮।

www.al-itisam.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের দৃষ্টি এমন এক সম্পদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, যা কখনো চুরি হয় না, আগুনে পুড়ে না, মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হয় না এবং ক্বিয়ামতের দিনও মানুষের উপকারে আসে। সেই সম্পদ হলো একটি কৃতজ্ঞ হৃদয়, একটি যিকিরকারী জিহ্বা এবং এমন একজন দ্বীনদার জীবনসঙ্গিনী, যিনি আখেরাতের পথে সহযোগিতা করেন। যে ব্যক্তি এই তিনটি নেয়ামত লাভ করে, সে প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত। কারণ এগুলোই মানুষের দুনিয়ার শান্তি, পারিবারিক বরকত এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী সফলতার ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞ হৃদয়, যিকিরে সজীব জিহ্বা এবং এমন পরিবার দান করুন, যারা পরস্পরকে জান্নাতের পথে সহযোগিতা করে- আমীন!

প্রিয় ত্বলেবুল ইলম ভাইয়েরা! আমরা ইলম অর্জনের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করি, কিতাব পড়ি, পরীক্ষা দিই, সনদের জন্য চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা ভেবে দেখেছি কি, যে তিনটি সম্পদকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলেছেন, সেগুলো অর্জনের জন্য আমরা কতটুকু চেষ্টা করছি?

দুঃখের বিষয় হলো, অনেক ত্বলেবুল ইলম ইলম অর্জন করছে; কিন্তু কৃতজ্ঞ হৃদয় গড়ে তুলছে না। সামান্য কষ্ট, সামান্য অভাব বা সামান্য পরীক্ষায় অভিযোগে ভরে যায় অন্তর। অথচ কৃতজ্ঞ হৃদয়ই আল্লাহর আরও নেয়ামত লাভের চাবিকাঠি।

আবার অনেকের জিহ্বা কিতাবের আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও দুনিয়াবী কথায় ব্যস্ত; কিন্তু আল্লাহর যিকিরে শুষ্ক। অথচ যে জিহ্বা যিকিরে সজীব নয়, সেই জিহ্বা থেকে ইলমের বরকতও ধীরে ধীরে কমে যায়।

আর ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেকেই দ্বীনের চেয়ে সৌন্দর্য, অর্থ, বংশ বা দুনিয়াবী বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে এমন সংসার গড়ে ওঠে, যা আখেরাতের সফরে সহযোগী না হয়ে অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এমন জীবনসঙ্গীর কথা বলেছেন, যিনি আখেরাতের পথে সাহায্য করবেন।

প্রিয় শিক্ষার্থীগণ! মনে রাখবেন, একজন আলেমের প্রকৃত পরিচয় শুধু তার জ্ঞান নয়; তার কৃতজ্ঞ হৃদয়, যিকিরময় জিহ্বা এবং তাক্বওয়াভিত্তিক পারিবারিক জীবন। এগুলো ছাড়া ইলমের সৌন্দর্য পূর্ণতা পায় না।

তাই আসুন, আমরা শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার সংকল্প না করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত এই তিন অমূল্য সম্পদ অর্জনেরও দৃঢ় সংকল্প করি। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এমন হৃদয় দান করেন, যা সর্বদা শোকরগুজার; এমন জিহ্বা দান করেন, যা সদা তাঁর যিকিরে সজীব এবং এমন পরিবার দান করেন, যা আমাদের জান্নাতের পথে এগিয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ইলমকে আমলে, আমলকে ইখলাছে এবং জীবনকে তাঁর সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ করে দিন- আমীন!

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, শায়খ-মাশায়েখ, দাঈ ও ত্বলেবুল ইলম! আমরা এমন এক আমানতের বাহক, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে চিনে এবং হেদায়াতের পথ খুঁজে পায়। তাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো আমরা কি শুধু ইলমের বাহক, নাকি ইলমের বাস্তব নমুনাও?

রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন তিনটি সম্পদের কথা বলেছেন, যা একজন মুমিনের প্রকৃত সৌভাগ্য তথা কৃতজ্ঞ অন্তর, আল্লাহর যিকিরে সজীব জিহ্বা ও আখেরাতের পথে সহায়ক দ্বীনদার জীবনসঙ্গী। গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, একজন দাঈ, আলেম বা স্কলারের সফলতার ভিত্তিও এই তিনটি বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

আজ আমাদের সবার উচিত নিজেদেরকে প্রশ্ন করা, আমার জিহ্বা কি মানুষের সামনে বক্তৃতার চেয়ে আল্লাহর যিকিরে বেশি সজীব? আমার অন্তর কি মানুষের প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়ায় বেশি পরিপূর্ণ? আমার ঘর কি দাওয়াতের শক্তি, নাকি দাওয়াতের দুর্বলতা?

ইলম, বক্তৃতা, জনপ্রিয়তা, অনুসারী, সামাজিক মর্যাদা— এসবই নেয়ামত। কিন্তু যদি কৃতজ্ঞতা হারিয়ে যায়, যিকির কমে যায় আর ঘরে দ্বীনের পরিবেশ দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে বাহ্যিক সাফল্যের আড়ালে অন্তরের দেউলিয়াত্ব তৈরি হতে পারে।

তাই আসুন, আমরা কেবল ভালো বক্তা বা ভালো লেখক হওয়ার চেষ্টা না করে, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বান্দা হওয়ার চেষ্টা করি। কারণ ক্বিয়ামতের দিন মানুষ আমাদের করতালি, অনুসারীর সংখ্যা বা ভাইরাল বক্তব্য দিয়ে বিচার হবে না; বিচার হবে ইখলাছ, তাক্বওয়া ও আমল দিয়ে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এমন ইলম দান করুন, যা আমল সৃষ্টি করে; এমন যিকির দান করুন, যা অন্তরকে জীবিত রাখে; এমন শোকর দান করুন, যা নেয়ামত বৃদ্ধি করে এবং এমন পরিবার দান করুন, যা আমাদের জান্নাতের পথে সহযাত্রী হয়- আমীন!

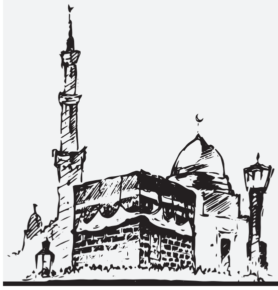

হারামাইনের মিম্বার থেকে

আল্লাহর সান্নিধ্যই মুমিনের শ্রেষ্ঠ সম্বল

[২৫ মুহাররম, ১৪৪৮ হি. মোতাবেক ১০ জুলাই, ২০২৬ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. উসামাহ ইবনু আব্দুল্লাহ খাইয়াত** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন **ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর সান্নিধ্য দ্বারা তাঁর বান্দাদের পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। আমি তাঁর পবিত্র সত্তার প্রশংসা করি, যার অফুরন্ত নেয়ামত আমি গণনা করে শেষ করতে পারি না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর অসংখ্য অনুগ্রহ ও নেয়ামতের যথার্থ প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি আল্লাহর বার্তা যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন, অর্পিত আমানত পূর্ণরূপে আদায় করেছেন এবং আল্লাহর পথে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও সাধনা করেছেন। হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি রহমত, শান্তি ও বরকত অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় করে চলুন। প্রত্যেক পরহেজগার, আল্লাহভীরু ও বিনয়ী ব্যক্তির পথ অনুসরণ করুন; যে তার দুনিয়াকে আখেরাতের জন্য পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করে, তার রব ও সর্বোত্তম অভিভাবকের সন্তুষ্টি কামনা করে এবং নিজের প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত চাহিদার উপর তার রবের সন্তুষ্টিকেই অগ্রাধিকার দেয়।

হে মুসলিমগণ! জীবনে চলার পথে মানুষ নানা কোলাহল, দুনিয়ার মোহ, অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা, পরীক্ষা, বিপদ ও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তখন সে অনুভব করে, তার এমন একজনের প্রয়োজন, যিনি তাকে সাহস দেবেন, শক্তি জোগাবেন, মনোবল দৃঢ় করবেন এবং বিপদের সময় সাহায্য করবেন। এমন একজনকে প্রয়োজন, যার উপর সে পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে এবং যার আশ্রয়ে সত্যিকারের শান্তি ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

হে মুসলিমগণ! সাহায্যকারী ও সমর্থনদাতা যত বেশি মর্যাদাবান, শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হন; মানুষের অন্তরে তত বেশি শান্তি, সাহস ও নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হয়। আর মুমিনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী ও অভিভাবক হলেন মহান আল্লাহ। তাই আল্লাহর সান্নিধ্যই মুমিনের সবচেয়ে বড় সম্বল এবং জীবনের সর্বোত্তম পাথেয়। এই সান্নিধ্য তাকে দুনিয়ার কঠিন পথচলায় শক্তি জোগায় এবং আল্লাহ ও আখেরাতের পথে অবিচল থাকতে সাহস দেয়।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি যে অনুগ্রহসমূহ দান করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো তাঁর বিশেষ সান্নিধ্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি তোমরা বিজয়

কামনা করে থাক, তাহলে তো তোমাদের নিকট বিজয় এসে গেছে। আর যদি তোমরা বিরত হও, তাহলে সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা পুনরায় কর, তাহলে আমিও পুনরায় করব এবং তোমাদের দল কখনও তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না যদিও তা অধিক হয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের সাথে আছেন' *(আল-আনফাল, ৮/১৯)*।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ঘটনায় আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতি তাঁর বিশেষ সান্নিধ্য দান করেন। আর সেই সান্নিধ্যের প্রভাব ও ফলাফল ছিল অতুলনীয়, যা যুগে যুগে মুমিনদের জন্য সাহস, আশা ও ঈমানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রবের উদ্দেশ্যে হিজরত করলেন, যাতে তাঁর সঙ্গী ছিলেন আবূ বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লা-হু আনহু। শত্রুরা তাদের অনুসরণ করতে করতে গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তখন এই দ্বীনী দাওয়াতের আলো নিভে যাওয়ার আশঙ্কায় আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, তাদের কেউ যদি নিজের পায়ের নিচের দিকে তাকায়, তবে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন নবী ﷺ সেই ঐতিহাসিক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, যার প্রতি সমগ্র পৃথিবী শ্রবণমগ্ন হয়েছিল এবং যার প্রভাবে মানুষের অন্তরসমূহ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, 'হে আবূ বকর! ওই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় জন আল্লাহ?'[৩৮]

নবী ﷺ-এর এই বাণী ছিল এক উজ্জ্বল প্রমাণ, সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং অকাট্য দলীল- যা প্রমাণ করে যে, তিনি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে সর্বোচ্চ প্রশান্তি লাভ করেছিলেন, তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রেখেছিলেন এবং তাঁর সাহায্য ও বিজয় লাভের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছিলেন। এমনকি মহান আল্লাহ এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুরআনুল কারীমে এমন আয়াত নাযিল করেছেন, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হবে এবং তা যুগে যুগে মানুষের জন্য উপদেশ ও শিক্ষা হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা এ চিরস্মরণীয় দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ করেন, 'যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বের করে দিল, সে ছিল দুজনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' *(আত-তাওবা, ৯/৪০)*।

এরপর আল্লাহর তাআলার সান্নিধ্য লাভের প্রভাব প্রকাশ পেল এবং এর ফলাফলও স্পষ্ট হয়ে উঠল। মহান আল্লাহ আয়াতের পরের অংশে বলেন, 'অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান' *(আত-তাওবা, ৯/৪০)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এ ঘটনায় জ্ঞানী ও বিবেকবান মানুষের জন্য রয়েছে মহান শিক্ষা ও উপদেশ। এটি প্রত্যেক মুমিনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণ অনুসরণ, তাঁর উত্তম আদর্শ গ্রহণ এবং তাঁর সুন্নাহর উপর অবিচল থাকার আহ্বান জানায়। কারণ মুমিনের অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ় থাকে যে, মহান আল্লাহ কখনও সত্যবাদী, বিনয়ী ও ঈমানদার বান্দাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেন না। তিনি তাদের থেকে তাঁর সাহায্য ও অনুগ্রহ ফিরিয়ে নেন না; যদিও তাদের উপর একের পর এক বিপদ, পরীক্ষা ও সংকট নেমে আসে।

হে মুসলিমগণ! আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্য কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক মুমিন তার ঈমানের পরিমাণ অনুযায়ী এ সান্নিধ্য লাভ করে। যার ঈমান যত শক্তিশালী হবে, সে তত বেশি আল্লাহর বিশেষ সাহায্য, হেফাযত ও সান্নিধ্য লাভ করবে। তাই আমাদের উচিত ঈমানকে আরও মযবূত করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।

এ কারণেই মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 'যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, 'তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' *(আত-তাওবা, ৯/৪০)*।

এ সম্পর্কে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও যথার্থ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্তর ও কর্মের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর আনীত দ্বীনের অনুসারী হবে, আল্লাহ তার সঙ্গেও থাকবেন; যদিও সে শারীরিকভাবে তাঁর

৩৮. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৫৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৮১।

সাহচর্য লাভ না করে।

আর যখন আল্লাহ কোনো বান্দার সঙ্গে থাকেন, তখন তার জন্য সব কষ্টকর বিষয় সহজ হয়ে যায় এবং সব ভয় নিরাপত্তায় পরিণত হয়। আল্লাহর সাহায্যে প্রতিটি কঠিন বিষয় সহজ হয়ে যায়, প্রতিটি দুঃসাধ্য কাজ সহজসাধ্য হয় এবং প্রতিটি দূরের বিষয় নিকটবর্তী হয়ে ওঠে। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমেই দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও দুঃখ দূর হয়ে যায়। কাজেই আল্লাহ বান্দার সঙ্গে থাকলে তার আর কোনো দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও শোক অবশিষ্ট থাকে না।

অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর সেই বিশেষ সান্নিধ্য লাভের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, যা তিনি তাঁর তাক্বওয়াবান, অনুগত ও নেককার বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। যারা তাঁকে ভয় করে, তাঁর নির্দেশ মেনে চলে, তাঁর সন্তুষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, একনিষ্ঠভাবে তাঁর দ্বীন পালন করে এবং সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করে; তাদের সঙ্গেই আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্য থাকে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ’ *(আন-নাহল, ১৬/১২৮)*।

أقولُ قولي هذا، وأستغفرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মুমিনদের সাহায্যকারী ও সমর্থনদাতা। আমি তাঁরই প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের সাহায্য করেন, তাদের শক্তি দান করেন এবং তাদের বিজয় দান করেন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা, রাসূল ও মুত্তাক্বীদের ইমাম এবং ক্বিয়ামতের দিন উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্ট (ক্বিয়ামতের দিন ওযূর চিহ্নে দীপ্তিমান) উম্মতের নেতা।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ, তাঁর সকল ছাহাবী এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের উত্তম অনুসারীদের প্রতি আপনার অশেষ রহমত, শান্তি ও বরকত অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় মহান আল্লাহর বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের সঙ্গে আছেন’ *(আল-আনফাল, ৮/১৯)*। এই আয়াত সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বলেন, ‘আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সঙ্গে আছেন’-এর অর্থ শুধু এই নয় যে, তিনি তাদের অবস্থা, আমল ও নিয়্যত সম্পর্কে অবগত; বরং এর অর্থ আরও হলো তিনি তাদের সাহায্য করেন, হেফাযত করেন এবং শক্তি জোগান। তাই যখন কোনো মুমিন অনুভব করে যে, আল্লাহ তার সঙ্গে আছেন; তখন সে বিশ্বাস করে যে, সে এমন এক শক্তির সঙ্গে যুক্ত, যা কখনও পরাজিত হয় না এবং এমন এক সাহায্য দ্বারা সমর্থিত, যা কখনো নিঃশেষ হয় না। ফলে সে নিজের নফসের বিরুদ্ধে, জীবনের কষ্ট-ক্লেশের বিরুদ্ধে এবং নিজের প্রবৃত্তি ও শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় করুন। মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের এই বিশেষ অনুভূতি সর্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখার চেষ্টা করুন। কেননা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের এই মহান অনুগ্রহ ছাড়া আপনাদের কোনো গত্যন্তর নেই এবং এটি ব্যতীত আপনাদের জীবন সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিতও হতে পারবে না। কাজেই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের দাবিগুলো পূরণ করুন এবং এর উপায়-উপকরণসমূহ গ্রহণ করুন। ফলে আপনাদের সকল বিষয় সুশৃঙ্খল ও সঠিক হবে এবং আপনাদের জীবন হবে সুখী ও সমৃদ্ধ। আর আপনারা সফলকাম ও সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

[এরপর সম্মানিত খত্বীব t কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ, ক্ষমা প্রার্থনা এবং কল্যাণ কামনায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দেওয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ, অর্থবহ ও হৃদয়স্পর্শী দু‘আ তুলে ধরেন।]

পরিশেষে হে আল্লাহর বান্দাগণ! মনে রাখবেন, আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্যই মুমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি, নিরাপত্তা ও সফলতার উৎস। তাই আসুন, আমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করি, ঈমানকে দৃঢ় করি, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করি এবং সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করি। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং তাঁর আনুগত্যে অবিচল থাকে, আল্লাহ তাকে কখনও নিরাশ করেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর বিশেষ সান্নিধ্য, সাহায্য ও রহমত লাভের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

কুরআনের মর্মবাণী

রবের বাণী

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৯)

[সূরা আল-বাক্বারাহ: ৩৬-৩৮ আয়াত]

﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৩৬ আয়াত]

কিন্তু শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটাল। অসংখ্য বৈধ নেয়ামত থেকে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিষিদ্ধ একটি গাছের দিকে আকৃষ্ট করল।

আদম-সন্তানের অন্তরে ওয়াসওয়াসা তথা গোপন মেসেজ দেওয়ার ক্ষমতা মহান আল্লাহ শয়তানকে দিয়েছিলেন। সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে সে আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম -এর হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাদেরকে বুঝাল যে, যদি তারা এই গাছের নিকটবর্তী হয়, তাহলে তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকতে পারবে। শয়তানের প্ররোচনায় পা দিয়ে আদম আলাইহিস সালাম -এর পা পিছলে গেল এবং তিনি সরল পথ থেকে ছিটকে পড়লেন। শয়তানের পরিকল্পনা সফল হলো। তাদেরকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নেমে যেতে হলো। মহান আল্লাহ তখন বললেন, তোমরা পৃথিবীতে নেমে যাও। সেখানে তোমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষের চিরস্থায়ী শত্রু হবে। একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৃথিবীতেই তোমাদের বসবাস এবং জীবিকা থাকবে।

পৃথিবীতে মানুষের জীবন তাই নিছক আরামের জীবন নয়। এখানে শয়তানের সঙ্গে তার লড়াই চিরন্তন। বৈধতার বিশাল পৃথিবী সামনে থাকা সত্ত্বেও নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে। আর প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সে কি তার রবের সীমারেখা মানবে, নাকি শয়তানের প্ররোচনার কাছে আত্মসমর্পণ করবে?

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৩৭ আয়াত]

এরপর আদম আলাইহিস সালাম নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি অহংকার করলেন না, আত্মপক্ষ সমর্থন করে কোনো যুক্তি দিলেন না এবং নিজের ব্যর্থতার জন্য অন্য কাউকে দায়ী করলেন না; বরং অনুতপ্ত হলেন এবং নিজের রবের দিকে ফিরে আসতে চাইলেন।

মহান আল্লাহ নিজেই তাকে তওবার ভাষা শিক্ষা দিলেন। আদম আলাইহিস সালাম তার রবের শেখানো সেই ভাষায় ক্ষমা চাইলেন। আদম আলাইহিস সালাম -কে শিক্ষা দেওয়া সেই ভাষাটি হলো, 'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি যুলম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'।

আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নিলেন। নিশ্চয়ই তিনি বারবার তওবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু। এখানেই আদম ও ইবলীসের পথ আলাদা হয়ে গেছে। উভয়ের জীবনেই পরীক্ষা এসেছিল। ইবলীস অবাধ্যতার পর অহংকার করেছিল এবং নিজের অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করতে চেয়েছিল। আর আদম আলাইহিস সালাম ভুলের পর অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে রবের দিকে ফিরে এসেছিলেন।

মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, সে কখনো ভুল করবে না; বরং মানুষের মর্যাদা হলো, ভুল বুঝতে পারলে সে অহংকার ছেড়ে রবের দিকে ফিরে আসবে।

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৩৮ আয়াত]

এই সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনার পর মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য একটি চিরস্থায়ী নীতিমালার ঘোষণা দেন, যে নীতিমালা অনুসরণ করাই মুক্তি ও সফলতার একমাত্র পথ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সবাই পৃথিবীতে নেমে যাও। সেখানে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের জীবন অতিবাহিত হবে। শয়তান তোমাদের চিরশত্রু হিসেবে থাকবে। প্রবৃত্তির টান, পার্থিব জীবনের মোহ এবং নানাবিধ পরীক্ষা তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে।

তবে এসব পরীক্ষা, বিভ্রান্তি ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পিচ্ছিল পথে আমি তোমাদের দিশাহীন অবস্থায় ছেড়ে দেব না। বরং আলোর মশালস্বরূপ পথপ্রদর্শক হিসেবে যুগে যুগে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়াত পাঠাব। নবী-রাসূলগণ আসবেন এবং আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল হবে। কিতাব সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট করে সঠিক পথের দিশা দেবে আর নবী-রাসূলগণ সেই হেদায়াত বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে দেখাবেন।

বাকি অংশ ৩০ নং পেজে...

৩৯* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

খুলুকুল মুসলিম

পিতা-মাতার সাথে একজন মুসলিমের আচরণ

মূল: সুলতান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-উমরী
অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ বিন সাইদুর রহমান*

মানুষের জীবনে পিতা-মাতার মর্যাদা অত্যন্ত মহান। তারা সন্তানের জন্ম, লালনপালন ও শিক্ষাদানে অসীম ত্যাগ স্বীকার করেন। ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকে আল্লাহর ইবাদতের পরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। একজন মুসলিমের জন্য পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য, সেবা ও সদ্ব্যবহার করা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্তব্য। তাই পিতা-মাতার সাথে একজন মুসলিমের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, তা জানা ও বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরী।

১. তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের প্রতি ইহসান করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি' *(আল-আহক্বাফ, ৪৫/১৫)*।

২. তাদের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলা। আল্লাহ বলেন, ﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ 'তাদেরকে সম্মানজনক কথা বলো' *(আল-ইসরা, ১৭/২৩)*। আর তাদের সাথে উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলা। আল্লাহ বলেন, ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ 'তাদেরকে 'উফ্' পর্যন্ত বলো না' *(আল-ইসরা, ১৭/২৩)*।

৩. তাদেরকে নাফরমানী ছাড়া সকল বিষয়ে অনুসরণ করা। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ 'অনুসরণ শুধু ভালো কাজে'।[৪১]

৪. তাদের প্রয়োজনে খরচ করা, বিশেষ করে যখন তারা বৃদ্ধ হয়ে যায়।

৫. উপযুক্ত সময় ও উপলক্ষ্যে তাদেরকে উপহার দেওয়া।

৬. তাদের নাম ধরে না ডেকে 'আব্বা', 'আম্মা' ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দে ডাকবে। এমনকি যদি তারা কাফেরও হয় তবুও। যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার কাফের পিতাকে বলেছিলেন, 'ইয়া আবাতি' (হে আমার পিতা!)।

৭. তাদের কোনো আচরণে কষ্ট পেলেও ধৈর্যধারণ করা। হাদীছে এসেছে, فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ 'তাদের ক্ষেত্রেই জিহাদ করো'।[৪২]

৮. তাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করা।

৯. তাদের যতটুকু সম্ভব সেবা করা। আল্লাহ বলেন, ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ 'তাদের সঙ্গে দুনিয়ায় সদ্ব্যবহার করো' *(লুক্বমান, ৩১/১৫)*।

১০. যদি সন্তান তাদের সাথে না থাকে, তবে তাদের নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া ও দেখা করা।

১১. তারা মারা গেলে তাদের জন্য রহমতের দু'আ করা, মাগফিরাত কামনা করা, তাদের পক্ষ থেকে দান-ছাদাক্বা করা, তাদের ইচ্ছাগুলো পূরণ করা এবং তাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

১২. তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনার মানসিকতা রাখা।

১৩. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ নেওয়া ও মতামত চাওয়া।

১৪. তাদের অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া, বিশেষ করে সফরের ক্ষেত্রে।

১৫. তাদের (পিতা-মাতা) সংশোধনের ব্যাপারে কখনো হতাশ না হওয়া।

১৬. সুন্দর উপায়ে ও কোমলভাবে তাদেরকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করা।

১৭. যখন তুমি তাদের থেকে দূরে থাক, তখন ফোনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

১৮. স্ত্রী যেন পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা বা অবহেলার কারণ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা।

১৯. ঘর থেকে বের হওয়ার আগে নিশ্চিত হওয়া যে, বাইরে তাদের কোনো প্রয়োজন আছে কি-না।

২০. তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় ভদ্রতা ও শিষ্টাচার বজায় রাখা।

২১. যদি তাদের থেকে কোনো অন্যায় দেখ, তবে তা সংশোধনের ইচ্ছায় কঠোরতা বা রূঢ় ব্যবহার না করা; বরং প্রজ্ঞা, কোমলতা ও নম্রতার সাথে উপদেশ দেওয়া। আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ 'আর তুমি যদি কঠোর ও রূঢ় হৃদয়ের হও, তবে তারা তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে' *(আলে ইমরান, ৩/১৫৯)*।

২২. মিষ্টভাষী হওয়া এবং তাদেরকে আনন্দিত করা।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করে তাঁর প্রিয়পাত্রে পরিণত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৪০*অধ্যয়নরত, কুল্লিয়্যাহ ২য় বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৪১. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৪৫।

৪২. ছহীহ বুখারী, হা/৩০০৪।

ফাযায়েলে আমল

ফরয ছালাতের আগে ও পরে সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)*

১. ফরয ছালাতের আগে ও পরে ১২ রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ছালাত আদায় করা:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনে-রাতে (ফরয ছালাতের আগে ও পরে) ১২ রাকআত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে'।[৪৪]

শিক্ষা: পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য ফরয ছালাতের আগে ও পরে যে সুন্নাত ছালাতসমূহ রয়েছে, সেগুলো আদায় করা আমাদের কর্তব্য। এসব সুন্নাত ছালাত সম্পর্কে হাদীছে বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কিছু সুন্নাত ছালাতের ফযীলত অন্যগুলোর তুলনায় অধিক। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, এসব মর্যাদাপূর্ণ সুন্নাত ছালাত যথাযথভাবে আদায় করার প্রতি আন্তরিক যত্নশীল হওয়া।

২. ফজরের আগে দুই রাকআত সুন্নাতের শ্রেষ্ঠত্ব:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ফজরের আগের দুই রাকআত সুন্নাত পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সকল বস্তু হতে উত্তম'।[৪৫]

৩. যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং যুহার চার রাকআত ছালাতের শ্রেষ্ঠত্ব:

আবূ মূসা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا وَقَبْلَ الْأُولَى أَرْبَعًا بُنِيَ لَهُ بِهَا بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি চাশতের চার রাকআত এবং যোহরের পূর্বে চার রাকআত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়'।[৪৬]

আবূ ছালেহ মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، يَعْدِلْنَ بِصَلَاةِ السَّحَرِ 'যোহরের পূর্বে চার রাকআত ছালাত রাতের তাহাজ্জুদ ছালাতের সমান'।[৪৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِمَ اللهُ امْرَءًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আছর ছালাতের পূর্বে চার রাকআত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার উপর অনুগ্রহ করবেন'।[৪৮]

৪. জুমআর দিন সকাল সকাল মসজিদে যাওয়ার ছওয়াব:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমআর দিন নাপাকী থেকে গোসল করার মতো গোসল করবে, অতঃপর প্রথম প্রহরে মসজিদে গমন করবে, সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রহরে গমন করবে, সে যেন একটি গরু কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় প্রহরে গমন করবে, সে যেন একটি দুম্বা কুরবানী করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ প্রহরে গমন করবে, সে যেন একটি মুরগী উৎসর্গ করল। যে ব্যক্তি পঞ্চম প্রহরে গমন করবে, সে যেন একটি ডিম উৎসর্গ করল। অতঃপর ইমাম বের হয়ে এলে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়ে যিকির-খুৎবা শুনতে বসে পড়েন'।[৪৯]

শিক্ষা: উক্ত ছওয়াব নেওয়ার জন্য আমাদের অগ্রগামী হওয়া উচিত। কারণ মসজিদে আগে আগে যাওয়ার মাধ্যমে বিনামূল্যে উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি কুরবানী বা ছাদাক্বা করার সুযোগ রয়েছে।

৪৩* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
৪৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৮; মিশকাত, হা/১১৫৯।
৪৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৫; মিশকাত, হা/১১৬৪।
৪৬. আল-মু'জামুল আওসাত্ব, হা/৪৭৫৩; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৩৪৯।
৪৭. শুআবুল ঈমান, হা/২৮০৮; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৪৩১।
৪৮. আবূ দাউদ, হা/১২৭১; তিরমিযী, হা/৪৩০; মিশকাত, হা/১১৭০, 'হাসান'।
৪৯. ছহীহ বুখারী, হা/৮৮১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫০।

সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

ছালাতের ক্বিয়াম অবস্থার সুন্নাতসমূহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ছালাতের ক্বিয়াম অবস্থায় যেসব সুন্নাত রয়েছে, নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় রফউল ইয়াদাইন করা: আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, তখন কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন আর রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতেন, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ অর্থ: 'যে ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করে তিনি তা শুনেন। হে আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই'। কিন্তু সিজদায় দুই হাত উত্তোলন করতেন না'।[৫০]

চার স্থানে রফউল ইয়াদাইন করার দলীল রয়েছে— (১) তাকবীরে তাহরীমার সময়। (২) রুকূতে যাওয়ার সময়। (৩) রুকূ থেকে উঠার সময়; এই তিনটি স্থান ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। (৪) প্রথম তাশাহহুদ থেকে উঠার সময়। এটাও ছহীহ বুখারীতে ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হয়েছে।

২. রফউল ইয়াদাইন করার সময় হাতের আঙুলগুলো প্রসারিত রাখা সুন্নাত: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছালাত আরম্ভকালে দুই হাত উপরের দিকে প্রসারিত করে উঠাতেন'।[৫১]

৩. মুস্তাহাব জায়গা পর্যন্ত রফউল ইয়াদাইন করা সুন্নাত: রফউল ইয়াদাইন করার সীমারেখার ক্ষেত্রে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে:

(ক) ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রফউল ইয়াদাইন কাঁধ বরাবর হবে।[৫২]

(খ) ছহীহ মুসলিমে মালেক ইবনু হুওয়াইরিছ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রফউল ইয়াদাইন কানের লতি বরাবর হবে।[৫৩] যেহেতু উভয় পদ্ধতিই হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, কাজেই একজন মুছল্লী কখনো কাঁধ বরাবর, আবার কখনো কানের লতি বরাবর রফউল ইয়াদাইন করতে পারবে।

৪. তাকবীরে তাহরীমার পর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা সুন্নাত: এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যেমনটি ইবনু হুবায়রা রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।[৫৪]

৫. ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরা সুন্নাত: বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একজন মুছল্লীর জন্য উভয় পদ্ধতির উপর আমল করা মুস্তাহাব।

প্রথম পদ্ধতি: বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে। ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছালাতে দাঁড়াতেন, তখন আমি তাকে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখতে দেখেছি।[৫৫]

দ্বিতীয় পদ্ধতি: ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখবে। সাহল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের নির্দেশ দেওয়া হতো যে, প্রত্যেকে ছালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখবে।[৫৬] সুন্নাত বাস্তবায়নে আমলে ভিন্নতা আনয়নের নিমিত্তে একজন ব্যক্তি একবার বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে, আরেকবার ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখবে।

৬. দু'আয়ে ইসতিফতাহ (ছানা) পাঠ করা সুন্নাত: শরীআতে একাধিক দু'আয়ে ইসতিফতাহ (ছানা) বর্ণিত হয়েছে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দু'আ নিচে উল্লেখ করা হলো-

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المشْرِقِ وَالمغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ.

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপসমূহের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেরূপ তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পাপসমূহ হতে পরিচ্ছন্ন করো, যেরূপ পরিচ্ছন্ন করা হয় ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে।

৫০. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯০।
৫১. মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৮৭৫; আবূ দাঊদ, হা/৭৫৩; তিরমিযী, হা/২৪০। ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
৫২. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯০।
৫৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯১।
৫৪. আল-ইফছাহ, ১/১২৪।
৫৫. নাসাঈ, হা/৮৮৭, হাদীছ ছহীহ বলেছেন।
৫৬. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪০।

হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপসমূহ ধুয়ে ফেল পানি, বরফ, ও শিশির দ্বারা’।[৫৭]

৭. ‘ইস্তিআযা’ তথা শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া: ‘ইস্তিআযা’ তথা শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া সুন্নাত। ইস্তিআযার একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। একবার এক পদ্ধতিতে, আরেকবার অন্য পদ্ধতিতে ইস্তিআযা করা সুন্নাত। নিম্নে দুটি পদ্ধতি উল্লেখিত হলো—

(ক)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থ: ‘আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি’। এই পদ্ধতিতে আশ্রয় চাওয়া অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম পছন্দ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ‘যখন আপনি কুরআন তেলাওয়াত করবেন, তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবেন’ *(আন-নাহল, ১৬/৯৮)*।

(খ)

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থ: ‘আমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি’। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ‘যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/২০০)*।

৮. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলা: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ বলার পর ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ বলা সুন্নাত। নুআইম আল-মুজমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি, তিনি ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ পড়লেন, অতঃপর সূরা আল-ফাতিহা পড়লেন...। অতঃপর আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের সবার তুলনায় অধিক পরিমাণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরূপ ছালাত আদায় করতে পারি।[৫৮]

৫৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৬০০।

৫৮. নাসাঈ, হা/৯০৬; ইবনু খুযায়মা রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, ইবনু খুযায়মা, ১/২৫১। দারাকুত্বনী বলেন, এ হাদীছটি ছহীহ, তার সকল বর্ণনাকারী শক্তিশালী, আস-সুনান, ২/৪৬।

৯. ইমামের সাথে আমীন বলা: যেসব ছালাতে সশব্দে ক্বেরাআত পড়া হয়, সেসব ছালাতে ইমাম যখন সশব্দে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করে আমীন বলেন, তখন মুক্তাদীর জন্য আমীন বলা সুন্নাত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা যার আমীন (বলা) ও ফেরেশতাদের আমীন (বলা) মিলে যায়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়’।[৫৯] আমীন শব্দের অর্থ হচ্ছে, কবুল করুন!

১০. সূরা আল-ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া: প্রথম দুই রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার পর অন্য যে কোনো সূরা পাঠ করা সুন্নাত। এটাই অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত। আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার সঙ্গে আরও দুটি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষেপ করতেন...।[৬০]

যেসব ছালাতে সশব্দে ক্বেরাআত পড়া হয়, সেসব ছালাতে মুক্তাদী সূরা আল-ফাতিহার পর অন্য কোনো সূরা পাঠ করবেন না। বরং ইমামের ক্বেরাআত শুনবেন। ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রত্যেক ছালাতে প্রথম দুই রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ করা সুন্নাত। এব্যাপারে কোনো আলেম মতানৈক্য করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।[৬১]

৫৯. ছহীহ বুখারী, হা/৭৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/৪১০।

৬০. ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫১।

৬১. আল-মুগনী, ১/৫৬৮।

রবের বাণী-এর বাকি অংশ

অতএব, যারা আমার হেদায়াতের কথা জানবে এবং নিজেদের চিন্তা, বিশ্বাস ও জীবনকে সেই হেদায়াতের অনুসারী করবে, তাদের জন্য কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা কোনো দুঃখও করবে না। ভবিষ্যতে কী ঘটবে, এই পথে চলতে গিয়ে দুনিয়ায় কী বিপদ আসবে কিংবা মৃত্যুর পর তাদের পরিণতি কী হবে—এসব আশঙ্কা তাদের গ্রাস করবে না। কারণ তাদের দায়িত্ব মহান আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করবেন। একইভাবে অতীতের ব্যর্থতা, দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ কিংবা হারিয়ে যাওয়া নেয়ামতের জন্যও তারা অনুতাপ ও দুঃখে নিমজ্জিত থাকবে না। কেননা তারা তখন জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সুতরাং তারা এমন একটি পথ গ্রহণ করেছে, যার চূড়ান্ত গন্তব্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং চিরস্থায়ী জান্নাত।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিশুদের পর্নো আসক্তি থেকে মুক্তির উপায়

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

আমাদের সন্তানদের আমরা কখনোই সন্দেহ করি না। অধিকাংশ অভিভাবক এটা বিশ্বাসই করেন না যে, তাদের (১০-১৫ বছরের) সন্তান এডাল্ট মুভি দেখতে পারে। অথচ এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, অধিকাংশেরও বেশি কিশোর-কিশোরী এই অপকর্মের সাথে জড়িত। বাংলাদেশে সম্প্রতি করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৬২ শতাংশ কিশোর-কিশোরী এই কর্মের সাথে জড়িত। তাই আমরা তাদের যতটুকু নিষ্পাপ মনে করছি, ততটুকু নিষ্পাপ তারা নয়। তাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে আমরা তা উপলব্ধি করতে পরছি না। তাই আমাদের কিছু বিষয় জানা দরকার, যা দেখলে আমরা বুঝতে পারব সন্তান পর্নো আসক্ত কিনা।

পর্নো আসক্ত শিশু কীভাবে বুঝবেন?

কোনো শিশু যখন পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে উঠে, তখন তার আচার-আচরণে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষণ করা যাবে।-

১. সন্তানের হঠাৎ পরিবর্তন: সবসময় হাসিখুশি, হৈ-হুল্লোড় করা ছেলে যদি হঠাৎ করে এসব ছেড়ে দেয়, তাহলে তার খোঁজখবর নিতে হবে। বিভিন্ন কারণে শিশু-কিশোরদের আচরণে পরিবর্তন আসে। তন্মধ্যে একটি হলো পর্নো আসক্তি। যদি কোনো ছেলে খারাপ পরিবেশ বা সুযোগের কারণে এই খারাপ অভ্যাসে জড়িয়ে যায়, তাহলে সে কিছুটা চুপচাপ হয়ে যাবে।

২. মোবাইল ব্যবহার করা: সচরাচর অভিভাবকরা এসএসসির পর সন্তানদের মোবাইল দিয়ে থাকেন। কিন্তু মোবাইল ব্যবহারের (বিশেষ করে স্মার্টফোন) আদর্শ সময় হচ্ছে এইচএসসির পর। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমরা অভিভাবকরা সন্তান ক্লাস সেভেন/এইটে উঠার পরপরই মোবাইল দিয়ে দেই, যা তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। তাই সন্তান যদি ১২- ১৪ বছরের পরপরই মোবাইল ব্যবহারে আসক্ত হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এই বয়সটা যেহেতু ঝুঁকিপূর্ণ, সেহেতু এই বয়সে তার মোবাইল ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। তাই যদি সন্তান মোবাইলের বাহানা কিংবা বড়দের মোবাইল একাকী নিয়ে ব্যবহার করছে কিংবা মোবাইলের প্রতি আগ্রহ বেড়ে গেছে, তাহলে তা খতিয়ে দেখতে হবে।

৩. নিজেকে লুকানোর চেষ্টা: হঠাৎ করেই যদি আপনার সন্তান আপনার কাছ থেকে কিছু লুকাতে চাইছে- এমন ধারণা যদি হয়, তাহলে আপনাকে একটু খোঁজ নিতে হবে। বিশেষ করে যদি তার মোবাইল, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ, যা আগে আপনি অনায়াসে নিতে পারতেন, কিন্তু এখন সহজে প্রবেশ করতে পারছেন না। কিংবা আপনার উপস্থিতি তাকে হঠাৎ করে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে, তখন আপনাকে আরও সাবধান হতে হবে। কেননা মানুষ যখন অনৈতিক কাজ করে, তখন তার মধ্যে অপরাধবোধ চলে আসে এবং সে স্বভাবতই চায় না যে, তা কেউ দেখে ফেলুক।

৪. ডিভাইসে সময় বেশি দেওয়া: কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করেন যে, আপনার সন্তান আগের চাইতে বেশি মোবাইল, কম্পিউটার বা ল্যাপটপে সময় দিচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে- সে কোনো না কোনো কিছুতে ব্যস্ত। আর সেই ব্যস্ততা কী? সেটা খুঁজে বের করার দায়িত্ব আপনার।

৫. একাকী থাকা: সন্তান আগে সবার সাথে থাকা পছন্দ করলেও হঠাৎ করে সে একা থাকাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। সুযোগ পেলেই নিজের রুমে একাকী সময় পার করছে। কোথাও সবাই একসাথে যাওয়ার কথা থাকলে সে পিছিয়ে ঘরে একা থাকতে চাইছে। তার মানে সে সবার আড়ালে একাকী সময় নিতে চাচ্ছে। সন্তানের মধ্যে যদি এই ধরনের প্রবণতা দেখা দেয়, তাহলে তা মাথায় রেখে নজরদারি বাড়াতে হবে।

৬. অতিরিক্ত রাত জাগা: কৈশোরে পদার্পণ করেই যদি সন্তানের রাত জাগা বেড়ে যায়, তাহলে তার খোঁজখবর নিতে হবে। কেন সে রাত জাগবে? পড়াশোনার বাহানায়ও তাকে রাত জাগার অনুমতি দেওয়া যাবে না। কেননা হাই স্কুল লেভেলের পড়াশোনা এত ভারী নয় যে, ছাত্রদের রাত জেগে পড়াশোনা করতে হবে। সুতরাং হঠাৎ করে সন্তানের রাত জাগা বেড়ে গেলে অবশ্যই খবর নিতে হবে।

৭. হঠাৎ রাগান্বিত হওয়া: স্বাভাবিকভাবে ছেলেমেয়েরা কৈশোরে পদার্পণ করলে তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। কিন্তু যখন কেউ পর্নোগ্রাফিতে লিপ্ত হবে, তার মানসিক অবস্থা সবসময়ই অস্থির থাকবে। তাই সে কোনো কারণ ছাড়াই রাগান্বিত হলে বা অল্প কারণে বেশি রাগারাগি করলে তাকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে।

৮. শরীর বা চেহারার হঠাৎ পরিবর্তন: কৈশোরে পা দিলেই সবার শারীরিক পরিবর্তন হবে। কিন্তু কোনো কারণে যদি সন্তানের চোখের নিচে কালি জমে, হঠাৎ শুকিয়ে যায়, চেহারা ভেঙে যায়, তাহলে তার উপর নজর দেওয়া জরুরি। কেননা পর্নোগ্রাফির সাথে হস্তমৈথুনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, যা শিশুদের শরীরের ব্যাপক ক্ষতি করে।

৯. বন্ধুর সাথে ফিসফাস: সন্তান আগে বন্ধুদের সাথে সবার সামনে খোলামেলা আলাপ করলেই ইদানীং কিছু কাছের বন্ধুর আড়ালে-আবডালে কানাঘুষা বা ফিসফাস বেড়ে যায়, তাহলে জানার চেষ্টা করতে হবে কী বিষয়ে তাদের গোপনীয়তা।

৬২* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

১০. বন্ধুর বাড়িতে সময় দেওয়া: পড়াশোনা কিংবা অন্য কোনো অসীলায় সময়ে-অসময়ে কাছের কিংবা দূরের বন্ধুর বাড়িতে সময় দিতে থাকলে সাবধান হতে হবে। খবর নিতে হবে, যে সময় সন্তান বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে, ঐ সময় বাড়িতে অভিভাবক কেউ থাকছে কিনা।

শিশুদের ওপর পর্নোগ্রাফির প্রভাব:

শিশুদের উপর পর্নোগ্রাফির ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এর কারণে তাদের যেমন ধর্মীয় ও সামাজিক নৈতিক স্খলন ঘটে তেমনি শারীরিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হয়।

১. ধর্মীয় উদাসীনতা: শিশু যখন পর্নোগ্রাফিতে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে ধর্মীয় চেতনাবোধ কাজ করে না। ফলে সে ধীরে ধীরে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে সরে যায়। এভাবে সে একসময় যাবতীয় খারাপ কাজের সাথে জড়িয়ে ধর্মকর্ম ছেড়ে দিয়ে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে।

২. পড়াশোনায় অমনোযোগিতা: যখন শিশু এসব খারাপ কিছুর সাথে জড়িত হয়ে যায়, তখন তার চিন্তা-চেতনায় সবসময়ই এসব ঘুরতে থাকে। ফলে তার পড়াশোনার প্রতি অনীহা তৈরি হয় এবং সে পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে।

৩. গুরুজনদের প্রতি অসম্মান: নিয়মিত খারাপ ভিডিও দেখার কারণে শিশুদের গুরুজনদের উপদেশ বা যে কোন কথায় বিরক্ত হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে তারা গুরুজনদের প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখায় না কিংবা তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

৪. যৌনতার প্রতি আকর্ষণ: শিশু যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই যৌনতা বিষয়ক কনটেন্ট দেখে, তখন তার মধ্যে প্রতিনিয়ত যৌন আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়, যা তাকে যৌনতার দিকে ধাবিত করে।

৫. বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ: শিশুরা কৈশোরে পদার্পণের সাথে সাথে যৌন আসক্ত হয়ে গেলে তার মধ্যে সমবয়সী বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়, যা তাদের অপরিণামদর্শী কাজের দিকে ঠেলে দেয়।

৬. ইভটিজিং: শিশুদের মধ্যে যখন খারাপ চিন্তাধারা কাজ করে, তখন তারা জোট বেঁধে নারী গবেষণায় লিপ্ত হয়। একসময় তারা সমবয়সীদের প্রতি নানান মন্তব্যসহ ইভটিজিং করতে উৎসাহিত হয়।

৭. যৌনতা সম্পর্কে ভুল ধারনা: পশ্চিমা যৌন কালচারের সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে শিশুরা মনে করে এটাই বুঝি আসল জীবন। ফলে তারা ধর্মীয় চেতনাবোধের বিপরীতে বাস্তব জীবনে বিকৃত যৌনাচারসহ যৌনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা নিয়ে বড় হতে থাকে।

৮. বিকৃত যৌনাচার: ছোট বয়স থেকে যৌনতা সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে বড় হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে নানান ধরনের বিকৃত যৌনাচারের আকাঙ্খা জন্ম নেয়, যা তারা বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করে।

৯. আসক্তি: খারাপ কিছু দেখার ফলে শিশুদের মধ্যে এ সম্পর্কে তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যা তাদেরকে এ বিষয়ে আসক্ত করে তোলে। ফলে তারা এর বাস্তবিক চর্চা করতে গিয়ে নিজেদের উপর যুলম করে, যা তাদেরকে যৌন আসক্তির দিকে ঠেলে দেয়।

পর্নো আসক্তি ঠেকাতে করণীয়:

সন্তান খারাপ কিছুতে জড়িয়ে পড়ার আগেই অভিভাবককে এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে। সন্তান হাতের নাগালের বাইরে যাওয়ার আগেই তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরী।

১. ধর্মীয় অনুশাসন: পৃথিবীতে যাবতীয় মন্দকে জয় করার সহজ উপায় হচ্ছে ধর্মীয় অনুশাসন। পরিবারে ইসলামের সঠিক চর্চা থাকলে সেই পরিবারে কখনো শয়তান সহজে প্রবেশ করতে পারে না। তাই সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে নিজে সৎ থেকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও সৎ ও নৈতিক হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ছোটবেলা থেকে সন্তানরা ধর্মীয় ভাবধারায় বড় হলে তাদেরকে সহজে কেউ নষ্ট করতে পারে না।

২. সন্তানকে সময় দেওয়া: শিশু-কিশোররা মন্দ কাজে জড়িত হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে মা-বাবার সাথে দূরত্ব। প্রতিটি অভিভাবক যদি তাদের সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেন, তাহলে সন্তান তাদের অগোচরে কোনো খারাপ কাজের সাথে জড়িত হতে পারবে না।

৩. মোবাইলের নিয়ন্ত্রণ: শিশুদের কখনোই স্বাধীনভাবে মোবাইল দেওয়া যাবে না। যেসব শিশু ৮-১০ বছরে থাকবে, তাদের প্রতি কঠোর নজরদারি করতে হবে। আর ১২ বছরের পর ১৮ বছরের আগে কাউকে নিজস্ব মোবাইল দেওয়া যাবে না। শিশুরা প্রধানত মোবাইলের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফিতে জড়িত হয়। তাই কোন অবস্থাতেই ১৮ বছরের আগে মোবাইল দেওয়া যাবে না। মোবাইল ব্যবহার করলেও ফোনে প্রাইভেট ডিএনএস সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে। নতুবা এডাল্ট কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণ করতে অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে। একইসাথে বয়ঃসন্ধিতে থাকা সন্তানদের মোবাইল ব্যবহারের উপর সর্বোচ্চ নজরদারি রাখতে হবে।

৪. ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ: পারিবারিক ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ম তৈরি করুন। কখন, কোথায় এবং কী ধরনের ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা যাবে- তা নির্ধারণ করুন।

৫. প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ব্যবহার করুন: আপনার ইন্টারনেট সংযোগে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সেট করুন, যাতে আপনি বুঝতে পারেন আপনার ইন্টারনেট কানেকশন থেকে কে কী ব্যবহার করছে।

৬. বন্ধুদের খোঁজ নেওয়া: আপনার সন্তান কার সাথে মিশছে, কার সাথে সময় পার করছে, কাদেরকে বন্ধু বানিয়েছে তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ নিতে হবে। সন্তানের বন্ধু ভালো পরিবারের হলে সে ভালো হবে। যদি খারাপ পরিবেশের হয়, তাহলে তার খারাপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে।

৭. ছুটির সময় নজরদারি: বিভিন্ন ছুটিতে সন্তানকে নজরে রাখতে হবে। কেননা শিশুরা ছুটির দিনগুলোতে নানান বন্ধু-

বান্ধবদের মিশে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা নিয়ে থাকে। তাই ছুটির দিনে সন্তান কোথায়, কখন কার সাথে যায় কিংবা সময় পার করে, তা অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে।

৮. একাকী থাকতে না দেওয়া: যথা সম্ভব সন্তানকে ঘরে একা রাখা যাবে না। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। তাই বয়ঃসন্ধিতে পড়া শিশুরা ঘরে একা থাকলেই বিভিন্ন উৎস হতে পর্নোগ্রাফিতে লিপ্ত হবে।

৯. রাতজাগা বন্ধ করা: কোনো কারণেই মধ্য রাত পর্যন্ত সন্তানকে জেগে থাকতে দেওয়া যাবে না। কেননা রাত হচ্ছে শয়তানের শয়তানি কাজের উপযুক্ত সময়। কারণ এসময় মানুষের কোন আনাগোনা থাকে না।

১০. বন্ধুত্বসুলভ আচরণ: শিশুদের সাথে ছোটবেলা থেকেই বন্ধুর মতো মিশতে হবে, যাতে তার চাওয়া-পাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা সব আপনার সাথে শেয়ার করে। এতে তার হঠাৎ কোনো খারাপ পরিবর্তন হলে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন।

১১. সন্দেহ না করা: সন্তানের উপর সবসময়ই নজরদারি রাখতে হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তার উপর গোয়েন্দাগিরি করা যাবে না। সে যদি বুঝতে পারে আপনি তার উপর গোয়েন্দাগিরি করছেন, তাহলে তা হীতে বিপরীত হবে।

১২. সন্তানকে খেলাধুলায় উৎসাহ দিন: শিশুরা স্বভাবতই খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী থাকে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণে শিশুরা আগের মতো খেলাধুলা করতে পারে না। তাই তারা বাধ্য হয়ে মোবাইলে ডুবে আছে। তাদেরকে মাঠের খেলায় ফিরিয়ে নিতে হবে। যাতে তারা সুন্দর সময় অতিবাহিত করতে পারে।

১৩. সৃজনশীল কাজে উৎসাহ: শিশুদের ছোট থেকেই বই পড়া, ছবি আঁকা, গল্প-কবিতা লেখাসহ নানান ধরনের সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত রাখতে পারলে সে কখনোই খারাপ কাজে ইনভলভ হতে পারবে না। বর্তমানে আমাদের পরিবার ও সমাজে সৃজনশীল কাজের বড়ই অভাব। আগের দিনে শিশু কিশোররা নানান ধরনের ক্লাব করার মাধ্যমে নিজেদের সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত রাখত, যা বর্তমানে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

১৪. সুস্থ বিনোদন: আমাদের দেশে সুস্থ বিনোদনের বড় অভাব। যার ফলে শিশু-কিশোররা বিনোদনের বিকল্প হিসাবে খারাপটাকেই বেছে নিচ্ছে। তাই পর্যাপ্ত শিশু পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সুস্থ পরিবেশের জায়গা করে দিলে তারা অশ্লীলতার দিকে ধাবিত হবে না।

১৫. সচেতনতা তৈরি: শিশু-কিশোরদের পর্নোগ্রাফি রোধে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সচেতনতা থাকতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি করা গেলে শিশুদের এই ক্ষতি থেকে তাদের মুক্ত রাখা যাবে।

১৬. ইন্টারনেটের নিয়ন্ত্রণ: রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্নোগ্রাফি রোধে ইন্টারনেটের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে কোমলমতি শিশুরা অনলাইনে খারাপ কিছুর সাথে পরিচিত হতে না পারে।

১৭. আইনি পদক্ষেপ নিন: যদি আপনার সন্তান অন্য কাউকে এই ধরনের কনটেন্ট দেখাচ্ছে বা তৈরি করছে, তাহলে আইনি পদক্ষেপ নিন। আপনার সন্তানকে এই ধরনের কনটেন্ট পাঠানো বা দেখানো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।

পর্নো আসক্ত শিশুর চিকিৎসা:

শিশু যদি কোনো কারণে পর্নো আসক্ত হয় কিংবা সন্তান পর্ন দেখছে তা অভিভাবকরা জানতে পারলে তার জন্য কিছু করনীয় রয়েছে-

১. প্রথমেই শান্ত থাকুন: যদি আপনি বুঝতে পারেন কেউ খারাপ কিছুতে জড়িত, তাহলে শুরুতেই আপনার নিজেকে শান্ত রাখতে হবে। আমাদের অধিকাংশ অভিভাবক প্রথমেই যে ভুলটা করে, তা হলো- সন্তানের উপর উত্তেজিত হয়ে রাগারাগি করা, গালাগাল করা, মারধর করা, যা কখনোই করা যাবে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অভিভাবককে শান্ত থাকতে হবে।

২. শুরুতেই শাস্তি দিবেন না: শিশু অপরাধ করার সাথে সাথে তাকে শাস্তি দিবেন না। তার সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার করুন এবং তাকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

৩. সময় নিন: শিশু যখন অপরাধ করে ফেলে, তখন তাকে শোধরানোর জন্য একটু সময় নিন। কোনো তাড়াহুড়ো করা যাবে না। ধীরে ধীরে তার সাথে যোগাযোগ বাড়ান।

৪. অপরাধের কুফল সম্পর্কে জানান: সন্তান অপরাধ করার পরও যখন সে শাস্তির মুখোমুখি হবে না, তখন তার মনের মধ্যে এক ধরনের অপরাধবোধের জন্ম নিবে। তারপর আপনি যখন সময় নিয়ে তার সাথে কৃত অপরাধ সম্পর্কে আলাপ করবেন, তখন সে আপনাকে সাহায্য করবে। এই সুযোগে আপনি তাকে তার অপরাধ সম্পর্কে বলুন। আপনার সন্তানকে জানান যে, আপনি তার জন্য চিন্তিত এবং তাকে সাহায্য করতে চান। এই কাজটা কেন অপরাধ, এই কাজের কুফল কী, কেন ধর্মীয় ও বাস্তব জীবনে এই কাজ করা যাবে না- তা সুন্দর করে বুঝিয়ে বলুন। মনে রাখতে হবে বয়ঃসন্ধিকালীন শিশুরা কাদামাটির মতো। তাদের আপনি যত সুন্দরভাবে তৈরি করবেন, তারা তত সুন্দরভাবে তৈরি হবে।

৫. বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিন: সাধারণত অধিকাংশ অভিভাবক এসব সাইকোলজিক্যাল বিষয় সম্পর্কে তেমন ধারণা রাখে না। তাই সন্তানের জন্য ভালো একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া খুবই উত্তম। তারা আপনার সন্তানকে সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ এবং চিকিৎসা দিতে পারবেন।

শেষ কথা:

মনে রাখবেন আমরা সবাই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের পরিবারে যদি ইসলামের চর্চা থাকে, তাহলে শয়তান সেখানে সহজে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই শিশুদের ছোট থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে এবং তাদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আসুন শিশুদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আমরা তাদের সহযোগিতা করি।

মাঠের উন্মাদনা আর ছালাতে উদাসীনতা: এক দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

ভূমিকা:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আর তা হলো তাঁর ইবাদত করা। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি, যিনি মানবজাতিকে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার পথ প্রদর্শন করেছেন।

বর্তমান সময়ে মুসলিম সমাজের একটি বড় সংকট হলো অগ্রাধিকারের পরিবর্তন। অনেক মানুষ এমন বিষয়ের প্রতি গভীর আগ্রহ ও আবেগ প্রকাশ করে, যা তাদের দুনিয়াবী আনন্দ দিলেও আখেরাতে কোনো উপকারে আসে না। ফুটবল, ক্রিকেট কিংবা অন্যান্য খেলাধুলা কেবল চিত্তবিনোদন ও শরীর চর্চার উদ্দেশ্যে জায়েয হতে পারে। তবে যখন সেগুলো ফরয ছালাতে অবহেলার কারণ হয়, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে, সময়ের অপচয় ঘটায় এবং অন্য মানুষের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা একজন মুমিনের জন্য আত্মসমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

বিশ্বকাপ বা বড় কোনো ফুটবল ম্যাচের সময় আমরা প্রায়ই দেখি, রাত গভীর হওয়ার আগেই অনেক এলাকায় উৎসবের আমেজ শুরু হয়ে যায়। ভুভুজেলার কর্কশ শব্দ, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার, মোটরসাইকেলের বহর, আতশবাজি ও উল্লাসের কারণে শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ব্যক্তি এবং পরীক্ষার্থীরা চরম ভোগান্তির শিকার হন। একজন মুসলিমের চরিত্র কি এমন হওয়া উচিত?

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়'।[৬৪] অতএব, এমন আনন্দ-উল্লাস যা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়, তা ইসলামের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ 'আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*। এই আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত আল্লাহর ইবাদত। খেলাধুলা, ব্যবসা, শিক্ষা, বিনোদন—এসব জীবনের অংশ হতে পারে, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য নয়।

আল্লাহর ভালোবাসা নাকি দুনিয়ার মোহ?

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলুন, যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন, উপার্জিত সম্পদ, ব্যবসা এবং প্রিয় বাসস্থান আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে সংগ্রামের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর ফয়সালা নিয়ে আসেন' *(আত-তাওবা, ৯/২৪)*। এই আয়াতের শিক্ষা হলো, মুমিনের হৃদয়ে সর্বোচ্চ স্থান হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর।

আজ আমরা একটি ম্যাচের সময় ভুল করি না, কিন্তু অনেকেই ফজরের ছালাতের সময় ভুলে যাই। একটি খেলার জন্য রাত জাগতে কষ্ট হয় না, অথচ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে কষ্ট হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন জরুরী।

ফজরের ছালাতের মর্যাদা:

ফজরের ছালাত এমন একটি ইবাদত, যার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুনাফেক্বদের কাছে সবচেয়ে ভারী ছালাত হলো এশা ও ফজরের ছালাত। যদি তারা এর ফযীলত জানত, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এতে উপস্থিত হতো'।[৬৫]

এই হাদীছে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের ছালাতকে অবহেলা করার আচরণকে মুনাফেক্বদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রত্যেক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে

৬৩* চিকিৎসক, কলামিষ্ট ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

৬৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭।

৬৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫১।

‘মুনাফেক’ বলে রায় দেননি। তাই আমাদেরও উচিত আচরণের সমালোচনা করা, ব্যক্তির অন্তরের ঈমানের ফয়সালা না করা।

ছালাতে অবহেলার ভয়াবহতা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ‘তাদের পরে এমন এক প্রজন্ম এলো, যারা ছালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতএব, তারা অচিরেই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে’ *(মারইয়াম, ১৯/৫৯)*। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ‘অতএব, দুর্ভোগ সেইসব ছালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা তাদের ছালাত সম্পর্কে উদাসীন’ *(আল-মাঊন, ১০৭/৪-৫)*।

এই আয়াতগুলো আমাদের সতর্ক করে যে, ছালাতকে অবহেলা করা ঈমানের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ ছালাত শুধু একটি ইবাদত নয়; বরং এটি একজন বান্দার ঈমানের অন্যতম প্রধান নিদর্শন এবং আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্কের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন। তাই ছালাতের প্রতি উদাসীনতা একজন মুমিনের জন্য গভীর আত্মসমালোচনার বিষয়।

উম্মাহর প্রতি দায়িত্ব:

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমরা যুদ্ধ, নির্যাতন ও বাস্তুচ্যুতির শিকার। একজন মুসলিম হিসেবে তাদের জন্য দু‘আ করা, তাদের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হওয়া এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের ঈমানী ও মানবিক দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মুমিনরা পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সহমর্মিতায় একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে পুরো দেহ জেগে থাকে’।[৬৬]

এর অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীর কোথাও মুসলিমরা কষ্টে আছে বলে সব বৈধ বিনোদন হারাম হয়ে যায়। বরং এ থেকে শিক্ষা হলো, একজন মুসলিম যেন নিজের আনন্দ-উৎসবের মাঝেও উম্মাহর প্রতি দায়িত্ববোধ হারিয়ে না ফেলেন এবং আল্লাহর হক্ব আদায়ে অবহেলা না করেন। একজন মুমিনের আনন্দ কখনোই তাকে আল্লাহর আনুগত্য, উম্মাহর প্রতি সহমর্মিতা ও নৈতিক দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

৬৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৬।

সময় আল্লাহর দেওয়া সবচেয়ে মূল্যবান আমানত:

মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার সময়। হারিয়ে যাওয়া সম্পদ ফিরে পাওয়া যায়, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া একটি মুহূর্তও আর ফিরে আসে না। তাই ইসলাম সময়ের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ‘শপথ সময়ের! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে’ *(আল-আছর, ১০৩/১-৩)*। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মানুষ যদি কেবল সূরা আল-আছর নিয়ে চিন্তা করত, তবে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।[৬৭]

রাতের পর রাত একটি খেলার জন্য জেগে থাকা; অথচ কুরআন তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদ বা ফজরের ছালাতের জন্য সময় না বের করতে পারা একজন মুমিনের জন্য আত্মসমালোচনার বিষয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন বান্দার দুই নেয়ামত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে—তার জীবন কীভাবে কাটিয়েছে এবং তার যৌবন কোথায় ব্যয় করেছে’।[৬৮]

অপচয় ও অযথা উল্লাস:

বর্তমানে অনেক সময় দেখা যায়, একটি খেলা উপলক্ষে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হয় পতাকা, আতশবাজি, শোভাযাত্রা কিংবা শব্দদূষণ সৃষ্টিকারী সামগ্রীর পেছনে; অথচ পাশের দরিদ্র প্রতিবেশীর খোঁজ নেওয়ার সময় আমাদের হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ ‘নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই’ *(আল-ইসরা, ১৭/২৭)*। ইসলাম আনন্দ করতে নিষেধ করেনি; কিন্তু অপচয়, অহংকার এবং মানুষের কষ্টের কারণ হওয়া নিষিদ্ধ করেছে।

প্রতিবেশীর হক্ব:

অনেক সময় গভীর রাতে চিৎকার, হর্ন, ভুভুজেলা বা আতশবাজির কারণে শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও পরীক্ষার্থীরা কষ্ট পান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়’।[৬৯] অতএব, মুসলিমের

৬৭. তাফসীরুল ইমাম শাফেঈ, ৩/১৪৬১; মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৮/১৫২; তাফসীর ইবন কাছীর, ১/২০৩

৬৮. তিরমিযী, হা/২৪১৭।

৬৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৬।

আনন্দও হবে শালীন, পরিমিত এবং অন্যের জন্য কষ্টের কারণ হওয়া থেকে মুক্ত।

খেলাধুলা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলাম বৈধ খেলাধুলাকে নিষিদ্ধ করেনি; বরং নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেও স্ত্রীর দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন, ছাহাবীদের তির নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা, ঘোড়দৌড় ও শরীরচর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু যখন কোনো বিনোদন ফরয ছালাত নষ্ট করে, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে, অশ্লীলতা ও গালাগালির জন্ম দেয়, সময় ও অর্থের অপচয় ঘটায়, মানুষের কষ্টের কারণ হয়; তখন সেটি আর প্রশংসনীয় থাকে না। আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে তোমাদের গাফেল না করে’ *(আল-মুনাফিকূন, ৬৩/৯)*।

যদি সম্পদ ও সন্তান মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করতে পারে, তবে অন্যান্য দুনিয়াবী ব্যস্ততাও তা করতে পারে।

মুসলিম যুবকদের প্রতি আহ্বান:

যৌবন হলো শক্তি, উদ্যম ও কর্মক্ষমতার সময়। এই সময়ে মানুষ যে অভ্যাস গড়ে তোলে, তা-ই অনেক ক্ষেত্রে সারাজীবন তার চরিত্র ও জীবনযাত্রার অংশ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সাত শ্রেণির মানুষ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে। তাদের একজন হলো সেই যুবক, যে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে বেড়ে উঠেছে’।[৭০]

এখন প্রশ্ন হলো আমাদের যৌবন কি আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে ব্যয় হচ্ছে, নাকি ক্ষণস্থায়ী বিনোদন ও দুনিয়াবী ব্যস্ততায়?

আত্মসমালোচনার সময়:

আজ আমরা একটি দলের পরাজয়ে কাঁদি; কিন্তু নিজের গুনাহের জন্য কতবার অশ্রু ঝরিয়েছি? একজন খেলোয়াড়ের গোলে আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠি; কিন্তু কুরআনের একটি আয়াত শুনে আমাদের হৃদয় কতবার কেঁপে উঠেছে? একটি ম্যাচ দেখার জন্য আমরা বন্ধুদের ডাকি; কিন্তু ফজরের জামাআতে অংশ নেওয়ার জন্য কতজন বন্ধুকে ডেকেছি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের প্রত্যেককেই নিজের কাছে দিতে হবে।

ক্বিয়ামতের দিন প্রথম হিসাব হবে ছালাতের। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে, তা হলো ছালাত। যদি তা ঠিক থাকে, তবে তার সব আমল সফল হবে; আর যদি তা নষ্ট হয়, তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে’।[৭১]

তাই একজন মুসলিমের প্রথম চিন্তা হওয়া উচিত আমার ছালাত ঠিক আছে কি-না।

দাওয়াতের ভাষা কেমন হবে?

কোনো মুসলিম ভাইকে সংশোধনের সময় আমাদের ভাষা হতে হবে কোমল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ ‘আপনি আপনার রবের পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে’ *(আন-নাহল, ১৬/১২৫)*। তাই কাউকে অবমাননা বা গালমন্দ নয়; বরং ভালোবাসা, দলীল এবং উত্তম আচরণের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করাই নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর শিক্ষা।

পরিশেষে বলা যায়, একদিন এই পৃথিবীর সব বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যাবে। সব তারকা একদিন অবসর নেবেন। কোটি মানুষের উল্লাসও একদিন নীরব হয়ে যাবে। কিন্তু কবরের অন্ধকারে, হাশরের ময়দানে এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের সঙ্গে থাকবে না কোনো খেলোয়াড়, কোনো দল কিংবা কোনো ট্রফি। সেখানে আমাদের সঙ্গে থাকবে শুধু ঈমান, ছালাত, কুরআন এবং নেক আমল।

আসুন! আমরা খেলাধুলাকে খেলাধুলার জায়গায় রাখি; জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে না ফেলি। আমরা এমন মুসলিম হই, যারা বৈধ আনন্দ উপভোগ করে; কিন্তু কখনো আল্লাহর হক্ব আদায়ে অবহেলা করে না। ফজরের আযান আমাদের কাছে যেন যেকোনো খেলার শেষ বাঁশির চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়। আর আমাদের হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসা যেন একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর জন্যই হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ছালাতের হেফাযতকারী বানান, সময়ের সঠিক ব্যবহার করার তাওফীক্ব দান করেন, উম্মাহর দুঃখ-কষ্ট অনুভব করার তাওফীক্ব দান করেন এবং আমাদের অন্তরকে সর্বদা তাঁর স্মরণে সজীব রাখেন- আমীন!

---

৭০. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩১।

৭১. তিরমিযী, হা/৪১৩; নাসাঈ, হা/৪৬৫।

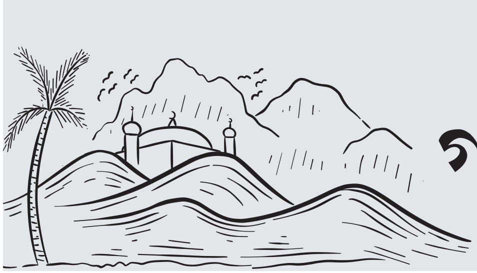

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

মাতৃত্ব

-সুপ্ত রায়হান সজিব*

[ফিলিস্তীনের বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত]

‘জানো আম্মা, মায়মুনের আব্বা ওর জন্য একটি সুন্দর কালো রঙের ফিলিস্তীনের ঐতিহ্যবাহী বিশেষ পোশাক কিনে এনেছে। আমার আব্বা পচা। আমার সঙ্গে দেখাই করে না’।

সন্তানের কথা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে যায় ফিদা কামাল আল-লাও। আজ নতুন করে সন্তানকে কী উত্তর দেবেন, ভেবে পান না। অশ্রুর চাপে চোখ দুটি যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। অনেক কষ্টে অশ্রুধারা সংবরণ করেন।

‘তোমার আব্বা আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। এজন্যই তিনি আমাদের কাছে আসতে পারেন না’। চোখ মুছতে মুছতে বরাবরের মতো একই উত্তর দেন মা।

অন্ধকারে মায়ের চোখের পানি দেখতে পায় না মেয়ে। আজও কথাটি মনঃপূত হলো না বাতুলের। মায়ের বালিশে মাথা গুঁজে সে প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা আম্মা! আব্বা আল্লাহর দেশ থেকে আমাদের ফোন দেয় না কেন?’

‘মা রে! আল্লাহর দেশে কোনো মোবাইল ফোন নেই। সেখানে গেলে কেউ ফোন করতে পারে না’। মেয়েকে বুকে টেনে নিতে নিতে বললেন মা।

‘আম্মা, আমিও আল্লাহর দেশে যেতে চাই। ওখানে গেলে কি আব্বার সঙ্গে আমার দেখা হবে?’ উল্টো প্রশ্ন করল বাতুল।

পাঁচ বছর বয়সী অবুঝ কন্যার অপরিণত কণ্ঠের এমন করুণ প্রশ্নে যেন তার হৃদয়ে শর বিঁধল। তবু তিনি কাঁদলেন না। মেয়ের চুলে বিলি কেটে দিয়ে বললেন, ‘অনেক রাত হয়েছে, মা! ঘুমাও এখন’।

‘আম্মা! কাল আমাকে একটি নীল ফুলওয়ালা পোশাক কিনে দেবে?’ মায়ের বুকে মাথা রেখে আবদার করল মেয়ে।

‘আচ্ছা! কিনে দেব, ইনশা-আল্লাহ। এখন তুমি ঘুমাও’। অস্ফুটস্বরে বললেন মা।

তিনি অনবরত মেয়ের চুলে বিলি কাটতে লাগলেন। বাতুল ঘুমপাড়ানি গান শোনার বায়না ধরল। মা ক্ষীণকণ্ঠে গাইতে শুরু করলেন ফিলিস্তীনের ঐতিহ্যবাহী লোরি-

‘নাম ইয়া হাবীবী নাম
নাম ইয়া হাবীবী নাম...’

ফিলিস্তীনী সংস্কৃতিতে এসব ঘুমপাড়ানি গান কেবল শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্য নয়; বরং সন্তানদের সাহসিকতা, মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা এবং শত কষ্টের মাঝেও টিকে থাকার অনুপ্রেরণা জোগাতেই এগুলো গাওয়া হয়।

বেদনার প্রাচীর ভেদ করে বুকে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে ফিলিস্তীনী মায়েরা সন্তানদের কানে তাই ‘তাহলীল’ শোনান। মায়াবী কণ্ঠের জাদুতে ঘুমিয়ে পড়ল বাতুল। মাথার নিচ থেকে হাত সরিয়ে বাতুলকে ডান কাঁধে কাত করে শুইয়ে দিয়ে মা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। তারপর ছেঁড়া কম্বল দিয়ে তার মাথাটা ঢেকে দিলেন।

চারদিকে নিস্তব্ধতা। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। ত্রিপল দিয়ে তৈরি তাঁবুর ভেতরে জীর্ণ ফোমের পাতলা ম্যাট্রেসের উপর বাকি ছয় সন্তানও অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে তাদের ঘুমন্ত নিস্তেজ দেহ।

ফিলিস্তীনীরা যে মানবেতর জীবনযাপন করছে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ গাযার দেইর আল-বালাহ অঞ্চলের বাস্তুচ্যুত অধিবাসীদের এই অস্থায়ী তাঁবুগুলো। ফিলিস্তীনীরা এ ধরনের

৭২* ফাজিলপুর (হাজিবাড়ি), তেঘরিয়া, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

অস্থায়ী শিবিরকে কেবল ‘তাঁবু’ বলেন না; তারা এগুলোকে তাদের কষ্টের ‘খোলা কারাগার’ বলে অভিহিত করেন।

ইসরাঈলী সেনাবাহিনীর অবর্ণনীয় নির্যাতন এবং বোমারু ড্রোনের অবিরাম হামলার শিকার হয়ে কয়েক দশক ধরে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তীনী বাস্তুচ্যুত হয়ে আছেন। তাদের স্বপ্নের আবাসগুলো ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই বিপদসংকুল পরিবেশে তারা বিপর্যয়কেই নিজেদের নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তাদের কাছে মৃত্যু যেন জান্নাতুল ফেরদাউস লাভের সহজতর পথ। তাই প্রতিনিয়ত এই ভগ্ন তাঁবুগুলোতে জাহান্নামের পোকামাকড়সম দখলদার বাহিনীর কাপুরুষোচিত হামলায় অনেকে শাহাদাতের মাধ্যমে জান্নাতের ঠিকানা খুঁজে নেন।

ইসরাঈলী বাহিনীর পক্ষ থেকে হঠাৎ লিফলেট ফেলা হয় কিংবা ফোনে বার্তা দেওয়া হয়—কয়েক মিনিটের মধ্যেই এলাকা ছেড়ে যেতে হবে। চারদিকে তখন ড্রোনের কর্কশ শব্দ, কামানের গর্জন এবং অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন এক বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। মানুষ তাদের সারাজীবনের সঞ্চয় ফেলে রেখে শুধু পরনের কাপড় আর কিছু জরুরী কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অনেক সময় কোনো মা তার সন্তানের জুতোজোড়া পরিয়ে দেওয়ার সময়টুকুও পান না।

মাইলের পর মাইল মানুষ পায়ে হেঁটে চলতে থাকে। রাস্তাজুড়ে পড়ে থাকে ধ্বংসস্তূপ, পোড়া গাড়ি আর ধুলাবালি। তথাকথিত ‘নিরাপদ করিডোর’ দিয়ে যাওয়ার সময়ও অনেককে হামলার শিকার হতে হয়। পুরুষরা পিঠে ভারী ব্যাগ, নারীরা কোলে শিশু এবং বৃদ্ধরা লাঠিতে ভর দিয়ে ক্লান্ত শরীরে পথ চলেন।

যখন তারা দেইর আল-বালাহ বা রাফাহর মতো এলাকায় পৌঁছান, তখন সেখানে তিল ধারণেরও জায়গা থাকে না। চারদিকে সারিবদ্ধ হাজার হাজার তাঁবু। বালু আর কাদার উপর নির্মিত এই অস্থায়ী আশ্রয়গুলোতে ন্যূনতম গোপনীয়তা বা ব্যক্তিগত পরিসরও নেই। শত শত মানুষের জন্য মাত্র একটি বা দুটি অস্থায়ী শৌচাগার। ফলে খুব দ্রুত হেপাটাইটিস, চর্মরোগসহ বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে।

এক টুকরো রুটি বা এক গ্যালন পানির জন্য শিশুদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। রান্নার জন্য কোনো গ্যাস নেই। মানুষ রাস্তার আবর্জনা কিংবা কার্ডবোর্ড পুড়িয়ে আগুন জ্বালায়। সেই আগুনের কালো, বিষাক্ত ধোঁয়া পুরো শিবিরের বাতাস ভারী করে তোলে।

কেউ জানে না তারা কত দিন এখানে থাকবে, কিংবা কোনো দিন নিজের ঘরে ফিরতে পারবে কি-না। শিশুরা পাখির ডাক বা বৃষ্টির শব্দ শুনলেও বোমার শব্দ ভেবে শিউরে ওঠে। তাদের খেলার মাঠ এখন ধ্বংসস্তূপ। অনেকে বাস্তুচ্যুত হওয়ার পথে পরিবারের সদস্যদের হারিয়ে ফেলেন।

তাঁবুর এক কোণে বসে বৃদ্ধদের বিলাপ করা গাযার বাস্তুচ্যুত শিবিরগুলোর এক নিত্যদিনের দৃশ্য।

এভাবেই গাযার রাজপথে মানবাধিকারকে কবর দিয়ে তাঁবুর ভেতরে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে শাহাদাতের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন ফিলিস্তীনের বাসিন্দারা।

আকাশে চাঁদ থাকলেও তার আভা গোল পূর্ণিমার মতো নয়; বরং তা ক্ষীয়মাণ কুঁজো চাঁদের মতো। আজ রবীউল আউয়ালের ১৭তম রাত। মাত্র দুই দিন আগেই ভরা পূর্ণিমায় রাত পূর্ণতা পেয়েছিল।

তাঁবুর বাইরে শরতের হিমেল ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। অদূরের কোনো এক জলপাইয়ের ঝোপ থেকে সুয়াইদ আশ-শাম অর্থাৎ সানবার্ড পাখির মিষ্টি শিস ভেসে আসছে।

ঘুমে ঢুলুঢুলু মায়ের চোখ তন্দ্রা পেরিয়ে নিদ্রার পারাবারে ভেসে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক দুঃস্বপ্নে আঁতকে উঠে তার ঘুম ভেঙে গেল। ডান হাত বাড়িয়ে তিনি মেয়ের শরীর খুঁজতে লাগলেন। হাতের স্পর্শে মেয়ের কায়া আবিষ্কৃত হলে তিনি স্বস্তির একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। না, আর ঘুমোবেন না তিনি।

গাযার সব মায়ের মতো তিনিও রাত জেগে সন্তানদের পাহারা দেন। কখন ইসরাঈলী বাহিনীর হামলা শুরু হবে, তা বলা বড়ই দুষ্কর।

গাযার মায়েদের রাত জাগা কেবল মাতৃত্বের সাধারণ দায়িত্ব নয়; এটি এক চরম অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাদের মনে সবসময় একটি গভীর ভয় কাজ করে, যদি তারা ঘুমিয়ে পড়েন, আর ঠিক সেই সময় কোনো হামলা হয়; তবে সন্তানদের রক্ষা করার বা সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ হয়তো আর পাবেন না। তাই তারা সারা রাত জেগে বাইরের প্রতিটি শব্দের প্রতি কান পেতে থাকেন।

আকাশে সারাক্ষণ ভেসে বেড়ানো ড্রোনের কর্কশ যান্ত্রিক শব্দ, যাকে স্থানীয়রা ‘জান্নানা’ বলে—ঘুমকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে। এই শব্দ মায়েদের মনে করিয়ে দেয়, বিপদ খুব কাছেই। তাই তারা জেগে থাকেন, যেন ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্রের শব্দ শোনা মাত্রই সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেন।

অনেক মা মনে করেন, যদি কোনো হামলা হয়, তবে অন্তত সন্তানদের বুকে আগলে রেখেই যেন মৃত্যু আসে। ফিদা কামালের মতো মায়েরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তানদের বুকের পাঁজর দিয়ে ঢেকে রাখতে সংকল্পবদ্ধ। তাদের কাছে রাত জাগা মানে হলো সন্তানের নিরাপত্তার জন্য নিজের জীবনকে ঢাল হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। তাই নির্ঘুম রাত কাটে গাযার মায়েদের।

এভাবেই কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা। চোখে ব্যথা অনুভূত হতে শুরু করল। তীব্র যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তিনি চোখ বুজলেন। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেলেন সেই উজ্জ্বল সোনালি অতীতে। ফিদা কামাল আল-লাও জন্মগ্রহণ করেছিলেন গাযার রাফাহ অঞ্চলে।

ব্যবসায়ী বাবার সচ্ছল সংসারেই কেটেছে তার শৈশব ও কৈশোর। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তাই পর্দার বিধান মেনে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব গাযা থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষাজীবন চলাকালীন যৌবনের প্রথম প্রহরেই পরিবারের উদ্যোগে এক অভিজাত পরিবারে তার বিয়ে হয়।

স্বামী সাফিন সালমান ছিলেন ইসরাঈলী আধিপত্যবাদের বিরোধী এক প্রথিতযশা ও লড়াকু সাংবাদিক। মুক্তিকামী ফিলিস্তীনবাসীর প্রতি ইসরাঈলী বাহিনীর বর্বরতার নির্মম চিত্র তার লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠত। তার সাংবাদিকতার কলম যেন কেবল একটি কলম ছিল না, ছিল শাণিত বেয়নেটের মতো তীক্ষ্ণ এক অস্ত্র।

অল্প সময়ের মধ্যেই তার লেখনী বিশ্ব মুসলিম গণমাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে তিনি যেন অনেকের কাছে এক আলোকবর্তিকায় পরিণত হন। সংক্ষেপে বলতে গেলে সমগ্র ফিলিস্তীনী জাতির কাছে তিনি ছিলেন এক আশার প্রতীক। কিন্তু এই কলমই একসময় তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বছর চারেক আগে, বাতুলের জন্মের কয়েক মাস পর, মোসাদের পরিকল্পিত এক হামলায় তিনি নিহত হন। জায়নবাদী বাহিনী তার মরদেহ পর্যন্ত দাফন করতে দেয়নি। প্রকাশ্য দিবালোকে গাযার রাস্তায় মরদেহটি পুড়িয়ে ফেলা হয়। সেই সময় তাকে হামাসের একজন সদস্য বলে আখ্যায়িত করা হয়।

স্বামীর জ্বলন্ত মরদেহের সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য ফিদার হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। তখনই তিনি মনে মনে সংকল্প করেন, আমৃত্যু নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ফিলিস্তীনের নিপীড়িত মানুষের পাশে থাকবেন। এরই ধারাবাহিকতায় এক বছর আগে হামাসকে সহায়তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক পদ হারান।

কয়েক মাস পর ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় তাদের সাধের বাড়ি। তারপর কোনোমতে প্রাণে বেঁচে সন্তানদের নিয়ে আশ্রয় নেন দেইর আল-বালাহর একটি শরণার্থী শিবিরে।

এত কিছুর পরও এই অদম্য নারী থেমে যাননি। নিজের বিশ্বাস ও আদর্শে অবিচল থেকে তিনি হামাসকে গোপনে নানাভাবে সাহায্য করে যাচ্ছেন।

অতীতের খেরো খাতায় হারিয়ে গিয়ে হঠাৎ ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলেন।

দ্রুম দ্রুম দ্রুম।

বিকট শব্দে এলাকা প্রকম্পিত হলো। ধড়ফড়িয়ে ঘুম থেকে ওঠে পড়লেন ফিদা কামাল আল-লাও। এক লাফে উঠে বাকি সন্তানদের জাগালেন। বাইরে ড্রোনের ফ্ল্যাশলাইটে আলোকিত চারপাশ। মাটিতে হেঁটে চলা পিঁপড়াদের কায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বাকি সন্তানদের দ্রুতপদে তাঁবুর বাইরে নিরাপদ দূরত্বে পাঠালেন।

বাতুল এখনো বিছানায় ঘুমিয়ে। তড়িঘড়ি করে ওকে টেনে তুললেন। ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। পাশের মসজিদে দ্রুতগতিতে আসা একটি মিসাইল আঘাত হানল। ছিটকে আসা আগুনের ফুলকিতে তাঁবুর পর্দা পুড়ে ছারখার।

বাতুল তখনও বিছানায় নিদ্রারত। দূর আকাশে মিসাইল-বৃষ্টি হচ্ছে। খোলা আকাশ, তাঁবুহীন বিছানা, উদ্যত হন্তারক মিসাইল।

বাতুলকে জাগানোর ব্যর্থ প্রয়াস চলছে। শোঁ শোঁ শব্দে একটি মিসাইল এদিকেই ধেয়ে আসছে। মা বুঝতে পারলেন তাক্বদীরে বুঝি নিহত হওয়াটাই লিখা আছে। বুকের মাঝে জাপটে ধরলেন বুকের মানিক বাতুলকে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

দ্রুম দ্রুম দ্রুম।

ফ্র্যাগমেন্টেশনের আঘাতে শহীদ হলেন মা ও মেয়ে। ফিদা কামাল আল-লাও কিন্তু পারতেন মেয়ে বাতুলকে রেখে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে। সে সময়টুকুও তাঁর ছিল।

কিন্তু বুকের মানিককে হারিয়ে পৃথিবীর বুকে আমৃত্যু নিভৃতে ধুঁকে ধুঁকে মরতে তিনি চাননি। আর এটাই মাতৃত্বের জ্বলন্ত সাক্ষ্য।

কবিতা

শরতের রূপ

-শফিকুল ইসলাম
শিক্ষক, গোবিন্দাসী উচ্চ বিদ্যালয়, ভুয়াপুর, টাংগাইল।

সকালবেলা ঘাসের ডগায়
ঝিলমিলিয়ে শিশির হাসে,
দুপুরবেলা কড়া রোদে
পাকা তালের গন্ধ আসে।
আকাশ জুড়ে মেঘের ভেলা
ভেসে বেড়ায় ইচ্ছেমতো,
পাহাড় থেকে ঝরনাধারা
ছুটে চলে অবিরত।
হঠাৎ করে বৃষ্টি হেসে
নেমে পড়ে ঝুপঝুপিয়ে,
তাই না দেখে গাঁয়ের কিষাণ
অবাক হয়ে থাকে চেয়ে।
নদীর দুধার ওঠে হেসে
সাদা সাদা কাশফুলে,
শরৎরানির এমন রূপে
মন ওঠে দুলে দুলে।

রূপে ভরা আশ্বিন

-শাকেরা বেগম শিমু

শিউলিতলায় শিউলি হাসে,
শুভ্র বকুল ঝরছে ঘাসে।
সকালবেলা তালের পিঠা,
খেতে লাগে বড়ই মিঠা।
নদীর তীরে কাশের মেলা,
নীল আকাশে মেঘের ভেলা।
বাবুই পাখির বাসা দূরে,
গাইছে বাবুই মধুর সুরে।
সবুজ মাঠে নবীন ধানে,
পুলক জাগায় চাষির প্রাণে,
রূপে ভরা আশ্বিন মাসে,
সবুজ ঘাসে মুক্তা হাসে।

বন্যা

-রমজান বিন শামসুল
খাগুরিয়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

বিশাল জলরাশিতে ঘর নাহি দেখা যায়,
এমন দৃশ্যে পরিণত শুধু সাগর বুঝা যায়।
বন্দী হয়ে আছে ওগো শত বোন-ভাই,
রহমানের রহম ছাড়া নেই কোনো উপায়।
প্রাকৃতির দুর্যোগে আজ ভিটেমাটি ছাড়া,
হঠাৎ চুপ হয়ে গেল এই অশান্ত পাড়া।
বোন বলে আমায় তোরা হাতটি ধরে বাঁচা,
দুনিয়া না দেখা শিশু ঘিরে আছে পেটের খাঁচা।
ভাঙা ঢেঁড়স গাছে ওগো বাঁধল ইঁদুর বাসা,
মরণ যেন না হয় তার এইতো মনে আশা।

আর্তের পাশে আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ

-মুহাম্মাদ মাহাফুজ আরিফ
বিএ (অনার্স), অর্থনীতি বিভাগ, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়,
বড়গাছি, পবা, রাজশাহী।

শ্রাবণের এই বুক চিরে আজ নামল যে বান,
পানিতে ভাসছে মানুষের স্বপ্ন আর প্রাণ।
পাহাড়ি ঢলেতে উপচে পড়েছে নদী,
চারিদিকে শুধু হাহাকার নিরবধি।
ঘরবাড়ি ডুবে গেছে অতল জলের তলে,
শিশুর কান্না ভাসে সেই বানের জলে।
আশ্রয়হীন মানুষ খোঁজে মাথা গোঁজার ঠাঁই,
বন্যার তোড়ে সব ভেসে গেছে, কিছু তো নাই।
এমন কঠিন দিনে পাশে এসে দাঁড়ায়,
'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ' সেবার হাত বাড়ায়।
ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন, তৃষ্ণার্তকে জল,
বিপদের মাঝে তারা ভরসার সম্বল।
মানবতার ডাকে তারা ছুটে যায় দ্বারে দ্বারে,
দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার তরে।
এই দুর্যোগ কেটে যাবে, জাগবে নতুন ভোর,
সেবার আলোয় কেটে যাবে বিপদের এই ঘোর।

সংবাদ

বাংলাদেশ সংবাদ

ঢাকায় ১,২০০ চাঁদাবাজ, ৪৫ এলাকায় প্রভাব বিস্তার

পুলিশের একটি অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজধানী ঢাকার ৪৫টি থানা এলাকায় প্রায় ১,২০০ চাঁদাবাজ সক্রিয় রয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরও রাজনৈতিক আশ্রয় ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাংশের পরোক্ষ সহযোগিতায় এসব চক্র তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, খিলক্ষেত, মোহাম্মদপুর, হাতিরঝিল, বাড্ডা, উত্তরা, ভাটারা, খিলগাঁও, পল্লবী ও আদাবরসহ কয়েকটি এলাকায় তাদের তৎপরতা বেশি।

ফুটপাতের দোকানদার, কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী, ভাঙারির দোকান, বাস-ট্রেন স্টেশন এবং গণপরিবহন খাত চাঁদাবাজির প্রধান শিকার। সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ব্যবসা চালিয়ে রাখতে নিয়মিত চাঁদা দিতে হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) তালিকাভুক্ত চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে ব্যবসায়ী ও সচেতন নাগরিকদের মতে, মাঠপর্যায়ের সদস্যদের পাশাপাশি এই চক্রের মূল হোতা ও আশ্রয়দাতাদের আইনের আওতায় আনলেই কেবল সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

অপ্রয়োজনীয় সিজার বন্ধে সরকারের কড়া নির্দেশ: বাধ্যতামূলক হচ্ছে নরমাল ডেলিভারি ট্র্যাকিং

দেশে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান প্রসবের হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা নিরুৎসাহিত করতে কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে সরকার। নতুন এই নীতিমালা অনুযায়ী, সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাগত কারণ ছাড়া সিজারিয়ান অপারেশন করা যাবে না। সব সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে প্রতিটি প্রসবের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া, স্বাভাবিক প্রসবকে উৎসাহিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা ও দক্ষ মিডওয়াইফদের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। অহেতুক সিজারিয়ান রোধে নিয়মিত মনিটরিং ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

ভারতে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন

জুন ও জুলাই মাসে ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও বৈষম্যের অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদনে আসামসহ কয়েকটি রাজ্যে উচ্ছেদ অভিযান, মসজিদ-মাদরাসায় অভিযান এবং বাংলাভাষী মুসলিমদের নাগরিকত্ব নিয়ে বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি, বৈধ ভারতীয় মুসলিম নাগরিকদের 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' আখ্যা দিয়ে সীমান্তে পুশব্যাকের অভিযোগও উঠেছে। কলকাতায় 'নিট' আন্দোলনের

সময় মুসলিম তরুণদের লক্ষ্য করে গ্রেপ্তার ও মামলার অভিযোগ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মানবাধিকারকর্মীরা।

এদিকে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ১৩৬ বছর পুরোনো গৌরীপুর জামে মসজিদে সাধারণ মুছল্লীদের জামাআতে ছালাত সাময়িকভাবে স্থগিত করাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার কারণ দেখালেও মসজিদ কর্তৃপক্ষ এটিকে ধর্মীয় অধিকার চর্চায় বাধা হিসেবে দেখছে।

অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের ভোজশালা–কামাল মওলা মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মূল চত্বরে জুমআর ছালাতের অনুমতি দেয়নি এবং ঐতিহাসিক স্থাপনাটির বর্তমান অবস্থা অপরিবর্তিত রাখার নির্দেশ বহাল রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক আদিনা মসজিদকে ঘিরেও নতুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের ধর্মীয় কর্মসূচির ঘোষণার পর ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ (ASI) জানিয়েছে, সংরক্ষিত এ ঐতিহাসিক স্থাপনায় নতুন ধর্মীয় স্থাপনা বা আচার-অনুষ্ঠান আইনসম্মত নয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

মুসলিম বিশ্ব

বেলুচ বিদ্রোহে তীব্র সংঘাত, ৪২ নিরাপত্তা সদস্য নিহত

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠী বেলুচ লিবারেশন আর্মি (BLA), বেলুচ লিবারেশন ফ্রন্ট (BLF) এবং বেলুচ রিপাবলিকান গার্ডস (BRG)-এর হামলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর পাল্টা অভিযানে সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (ISPR) জানিয়েছে, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় সমন্বিত হামলায় সেনাবাহিনী, ফ্রন্টিয়ার কর্পস ও পুলিশের অন্তত ৪২ সদস্য নিহত হয়েছেন। জবাবে পরিচালিত অভিযানে ৫৪ জন সশস্ত্র বিদ্রোহী নিহত হওয়ার দাবি করেছে সেনাবাহিনী। তবে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো সরকারি হতাহতের এই হিসাব প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক বঞ্চনা ও অধিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে কেন্দ্র করে বেলুচিস্তানে দীর্ঘদিন ধরে এই সংঘাত চলছে। সাম্প্রতিক সহিংসতায় অঞ্চলটির নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন মাইলফলক: দুই হাসপাতালের সমঝোতা স্মারক

দেশের ক্যান্সার চিকিৎসা সেবাকে আরও সহজলভ্য ও আধুনিক করতে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিকেল ফিজিক্স (INMP) এবং জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (NICRH)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন হয়। চুক্তির ফলে ক্যান্সার রোগীদের দীর্ঘ লাইনের ভোগান্তি ও অপেক্ষমাণ তালিকার অবসান ঘটবে। এখন থেকে রোগীরা দীর্ঘসূত্রতা ছাড়াই উন্নত প্রযুক্তির নিউক্লিয়ার মেডিসিন, নির্ভুল রোগ নির্ণয় ও নিবিড় থেরাপিউটিক সেবা পাবেন। চুক্তির আওতায় রোগীর সার্বিক ব্যবস্থাপনা, রেডিয়েশন অনকোলজি সেবা, গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করবে। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল এমপি-সহ দুই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, এই উদ্যোগ ক্যান্সার চিকিৎসায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে।

এআই ও পারমাণবিক ঝুঁকি: শঙ্কায় মানবসভ্যতা

সামরিক খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বিশ্বকে এক নজিরবিহীন পারমাণবিক ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা সতর্ক করেছেন যে, পারমাণবিক কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এআই-এর অন্তর্ভুক্তি মানবসভ্যতার জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। মূলত স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সাইবার আক্রমণের আশঙ্কাই এই উদ্বেগের প্রধান কারণ। অ্যালগরিদমের একটি ছোট ভুল বা হ্যাকারদের বিভ্রান্তিকর তথ্যের কারণে সেকেন্ডের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় পালটা পারমাণবিক হামলার সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারে, যেখানে মানুষের যাচাই করার কোনো সুযোগ থাকবে না। এছাড়া কৃত্রিম ডিপফেক ও ভুয়া যুদ্ধকালীন ভিডিও যেকোনো মুহূর্তে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করতে পারে। জাতিসংঘসহ বিশ্বনেতারা এখন জোর দাবি তুলছেন যেন পারমাণবিক অস্ত্র উৎক্ষেপণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সব সময় একজন মানুষের নিয়ন্ত্রণেই থাকে। এই ধ্বংসাত্মক প্রযুক্তি রুখতে অবিলম্বে কঠোর আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও আইনি নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা জরুরী।

সওয়াল-জওয়াব

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): কাদারিয়া ও মু'তাযিলা কারা? তাদের আক্বীদা জানতে চাই।

-মো. হাসিবুর রহমান
শালগাড়িয়া, পাবনা সদর।

উত্তর: কাদারিয়া ও মু'তাযিলা ইসলামের ইতিহাসে দুটি ভ্রষ্ট কালামভিত্তিক দল। যদিও তাদের মধ্যে কিছু বিষয়ে মিল আছে, তবে তারা একই দল নয়। কাদারিয়া হলো এমন একটি দল, যারা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে অস্বীকার করে। তারা বলে, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কর্ম সৃষ্টি করেননি; বরং বান্দা নিজেই তার কাজের স্রষ্টা। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জিনিস তাকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি' *(আল-ক্বামার, ৫৪/৪৯)*। তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও' *(আছ- ছাফফাত, ৩৭/৪০)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'সবকিছুই তাকদীর অনুযায়ী, এমনকি অক্ষমতা ও প্রজ্ঞাও' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৫)*। ইসলামী শরীআতে কাদারিয়ারা অগ্নিপূজক। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'কাদারিয়ারা এ উম্মতের মাজূস (অগ্নিপূজক)। তারা অসুস্থ হলে তাদের দেখতে যেয়ো না এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়ো না' *(আবূ দাঊদ, হা/৪৬৯১)*। মু'তাযিলা একটি ভ্রান্ত আক্বীদার দল, যারা ওয়াসিল ইবনু আতা আল-গাযযাল এর অনুসারী হিসেবে পরিচিত। তাদের মূলনীতি পাঁচটি- (১) তাওহীদ: তারা আল্লাহর তাআলার অনেক ছিফাত (গুণাবলি) অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা করে। (২) ন্যায়বিচার: তারা বলে, মানুষ নিজেই নিজের কাজ সৃষ্টি করে; আল্লাহ বান্দার কাজ সৃষ্টি করেন না। এখানেই তারা কাদারিয়াদের মত গ্রহণ করে। (৩) দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী অবস্থান: কাবীরা গুনাহকারী মুসলিম নয়, মুমিনও নয়, কাফেরও নয়; বরং দুনিয়াতে সে ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী একটি অবস্থানে থাকে। (৪) শাস্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়ন: আল্লাহ কাবীরা গুনাহকারীর জন্য কোনো সুপারিশ (শাফাআত) গ্রহণ করবেন না এবং সে যদি তওবা না করে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। (৫) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ: প্রয়োজনে শক্তি (তলোয়ার) প্রয়োগ করেও অন্যায় পরিবর্তন করা ও অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আবশ্যক হতে পারে।

প্রশ্ন (২): রাসূল ﷺ নবী হওয়ার পূর্বে কোন ধর্ম মানতেন বা কী ইবাদত করতেন? কীভাবে করতেন? তাঁর কাছে তো তখনও কোনো অহী করা হয়নি।

-সাজ্জাদ হোসেন
দিনাজপুর।

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুঅত লাভের পূর্বেও শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, আন-নাহল, ১৬/১২৩-এর তাফসীর, ৪/৬১৪-৬১৬)*। রাসূল ﷺ তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে শিরকমুক্ত যেসব ইবাদত করতে দেখতেন তিনি সে ইবাদত করার চেষ্টা করতেন। তিনি হেরা গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন এবং সেখানে বহু রাত ধরে 'তাহান্নুছ' তথা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০)*। অর্থাৎ তিনি নির্জনে আল্লাহর যিকির, চিন্তা-ভাবনা, দু'আ ও ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তবে তিনি তাওহীদের উপর ছিলেন, যদিও কুরআন ও শরীআতের বিস্তারিত বিধান তখনও তাঁর কাছে অহীর মাধ্যমে আসেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আপনি জানতেন না কিতাব কী এবং ঈমান কী' *(আশ-শূরা, ৪২/৫২)*।

প্রশ্ন (৩): মুহাম্মাদ ﷺ নবুঅত পাওয়ার আগে কত দিন হেরা গুহায় ধ্যান করেছিলেন এবং কী নিয়ে ধ্যান করেছিলেন অর্থাৎ তিনি সেখানে মূলত কী করতেন?

-মো. লতিফুর রহমান
ঢাকা।

উত্তর: রাসূল ﷺ নবুঅত লাভের পূর্বে নির্দিষ্ট কতদিন হেরা গুহায় নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন- এই ব্যাপারে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না। বর্ণনায় যা পাওয়া যায় তা হলো, তিনি প্রতি বছর রামাযান মাসজুড়ে হেরা গুহায় নির্জনতা অবলম্বন করতেন *(সীরাহ, ইবনু ইসহাক, ১/১২১; ফাতহুল বারী, ১/২৩)*। রাসূল ﷺ হেরা গুহায় ইবাদত করতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৩)*। কিন্তু এই ইবাদতের বিবরণ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। মুহাদ্দিছগণের মতে, তিনি শিরক ও মুশরিকদের ত্যাগ করে

নির্জনতা অবলম্বন এবং শুধু আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে নিমগ্ন হওয়ার মাধ্যমে ইবাদত করতেন *(ফাতহুল বারী, ৮/৭১৭)*।

প্রশ্ন (৪): মুসলিম দেশে হিন্দুরা বড় মূর্তি তৈরি করলে মুসলিমরা বাধা দিতে পারবে কি? এমন অবস্থায় মুসলিমদের কী করা উচিত? যেমন- পশালবাড়ির রামমূর্তি।

-খাইরুল
গাইবান্ধা।

উত্তর: মুসলিম দেশে আহলুয-যিম্মাহর (বিধর্মীদের) জন্য তাদের ধর্মের এমন কোনো প্রকাশ্য ধর্মীয় নিদর্শন (শাআইর) প্রকাশ করা বৈধ নয়, যা ইসলামের বিরোধী *(ইকতিদাউছ-ছিরাতিল মুস্তাকীম লি-মুখালাফাতি আছহাবিল জাহীম লি-ইবনে তাইমিয়্যাহ, ১/৪৫৭)*। হিন্দুদের মূর্তি তাদের ধর্মীয় নিদর্শন, যা ইসলামী শরীআতে মুসলিম দেশে নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে *(ছহীহ মুসলিম, হা/৯৬৯)*। তাই মুসলিম দেশের শাসকের বা রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলের মূর্তি নিশ্চিহ্ন করা উচিত। কেননা তার হাতে বৈধ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে *(আল-হাজ্জ, ২২/৪১; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯)*। রাষ্ট্র যিম্মিদের সাথে যেসব বিষয়ে চুক্তি করবে, সেসব বিষয়ের চুক্তি পূর্ণ করতে রাষ্ট্র বাধ্য। আর কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদের মূর্তি ভাঙতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না, কেননা তারা তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহকে গালি দেবে’ *(আল-আনআম, ৬/১০৮)*। আর সাধারণ মুসলিমের করণীয় হলো বৈধ উপায়ে নছীহত করা, কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং শরীআতসম্মত পন্থায় অন্যায় প্রতিরোধের চেষ্টা করা।

প্রশ্ন (৫): দু‘আর মাধ্যমে তাকদীর পরিবর্তন হয়। যা মানব সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে লেখা ছিল, তা কি পরিবর্তন হয়? নাকি সেটাও পূর্বনির্ধারিত?

-সালেহ
গাজীপুর।

উত্তর: দু‘আর মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত তাকদীর পরিবর্তন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন স্থির রাখেন, আর তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কিতাব’ *(আর-রা‘দ, ১৩/৩৯)*। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কা‘বা তওয়াফ করার সময় বলছিলেন, হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাকে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে লিখে থাকেন, তবে আমাকে তার উপর অটল রাখুন। আর যদি আপনি আমাকে দুর্ভাগ্যবান ও পাপীদের অন্তর্ভুক্ত করে লিখে থাকেন, তবে আমাকে সেখান থেকে মুছে দিন এবং আমাকে সৌভাগ্যবান ও ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি যা ইচ্ছা মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা স্থির রাখেন। আর আপনার কাছেই রয়েছে ‘উম্মুল কিতাব’ *(তাফসীরে কুরতুবী, ৯/৩৩০)*। ছাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সৎকর্ম ব্যতীত অন্য কিছু আয়ুষ্কাল বাড়াতে পারে না এবং দু‘আ ব্যতীত অন্য কিছুতে তাকদীর পরিবর্তন হয় না। মানুষ তার পাপকাজের দরুন তার প্রাপ্য রিযিক থেকে বঞ্চিত হয় *(ইবনু মাজাহ, হা/৪০২২)*।

প্রশ্ন (৬): অনেকে বলে, শহীদের মৃত্যু নেই। বাস্তবে তো সকলেই মারা যায়। তাহলে এভাবে বলা যাবে কি?

-ওমিদ হাসান
টাঙ্গাইল।

উত্তর: শহীদের মৃত্যু নেই- কথাটি প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হয় না, বরং শহীদের মর্যাদা বুঝাতে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ‘যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না’ *(আল-বাকারা, ২/১৫৪)*। সুতরাং রূপক অর্থে উক্ত কথা বলা যায়। আর মৃত্যুর পর বারযাখী জীবনে রূহের বিভিন্ন স্তর হয়ে থাকে, যেমন- কেউ পাখি হয়ে জান্নাতে উড়ে বেড়ায়, কেউ আল্লাহর আরশের নিচে ঝুলন্ত থাকে, নবীগণ বারযাখী জগতে সরাসরি জীবিত আছেন। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তারা বারযাখী জগতে জীবিত থাকে অর্থাৎ পাখি হয়ে জান্নাতে উড়ে বেড়ায় *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৮৭)*।

প্রশ্ন (৭): মানুষের মনে বারবার অতীতের পাপ বা বিভিন্ন কথা স্মরণে আসা কি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়? শয়তান কি মানুষের অতীত সম্পর্কে জানে এবং এভাবে কুমন্ত্রণা দিতে পারে?

-হাশেম
লালমনিরহাট।

উত্তর: (ক) অতীতের পাপ স্মরণে এসে যদি হতাশা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশা তৈরি করে অথবা পূর্বের করা পাপের স্বাদ স্মরণ করিয়ে পুনরায় পাপ করতে উৎসাহিত করে, তাহলে বুঝতে হবে এটা শয়তানের পক্ষ থেকে। আর যদি অতীতের পাপ স্মরণে এসে অনুশোচনা, বিনয়, তওবা ও ইস্তিগফার (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতে উৎসাহিত করে; তাহলে বুঝতে হবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ‘নিশ্চয় এই কানাঘুষা শয়তানের পক্ষ থেকে, যাতে সে মুমিনদেরকে দুঃখ দিতে পারে (এবং হতাশাগ্রস্ত করতে পারে)। তবে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। মুমিনদের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা’ *(আল-মুজাদালা,*

৫৮/১০)। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ‘শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় আর অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে তার ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ’ *(আল-বাকারা, ২/২৬৮)*। খ. শয়তান গায়েব জানে না *(আন-নামল, ২৭/৬৫)*। তবে তারই কুমন্ত্রণায় যে পাপ সংঘটিত হয়েছে তা সম্পর্কে অবশ্যই সে অবগত এবং তা দ্বারা সে কুমন্ত্রণা দেয় পুনরায় সেই পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য *(আন-নাস, ১১৪/৫-৬)*।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৮): রবিবার আমার হায়েয শুরু হয়। এরপর সোমবার ও মঙ্গলবার কোনো রক্ত দেখা যায়নি, কিন্তু বুধবার থেকে আবার নিয়মিত রক্তস্রাব শুরু হয়। এ অবস্থায় সোমবার ও মঙ্গলবারের ছালাতগুলো কি আমাকে কাযা করতে হবে, যেহেতু তখন আমি বুঝতে পারিনি যে রক্তস্রাব আবার শুরু হবে?

-সুমাইয়া
বুয়েট কোয়ার্টার।

উত্তর: সোমবার ও মঙ্গলবারের ছালাত কাযা করতে হবে না, যদি তা স্বাভাবিক হায়েযের সময়সীমার মধ্যেই হয়ে থাকে এবং পরে আবার রক্তস্রাব শুরু হয়। কারণ মাঝখানের অস্থায়ী বিরতি হায়েযের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ পবিত্রতার লক্ষণ না পাওয়া যায়। আর তা হলো, সাদা আঠালো পদার্থ যা মহিলারা চিনে থাকে। মহিলারা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট ন্যাকড়া বা তুলায় ভর্তি থলে পাঠাত, তাতে হলুদ বর্ণের রক্ত লেগে থাকত। তারা তাতে ছালাত আদায় করা যাবে কি-না তা জিজ্ঞাসা করত। তিনি বলতেন, তোমরা তাড়াহুড়া করো না, তাতে সাদা আঠালো পদার্থ না দেখা পর্যন্ত (অপেক্ষা করো)। তিনি এটা দ্বারা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া বুঝাতেন *(ছহীহ বুখারী ও ইরওয়াউল গালীল, ১৯৮)*। সুতরাং হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার মাপকাঠি হলো সাদা আঠালো পদার্থ যা হায়েযের শেষ দিকে নির্গত হয়ে থাকে। এর আগ পর্যন্ত হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। আর হায়েয অবস্থায় ছালাত আদায় করতে হবে না। আর তা দেখা গেলে গোসল করে পবিত্র হয়ে ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (৯): এক আলেম বলেছেন, পুকুর বা নদীতে অর্থাৎ খোলা জায়গায় গোসল করা যাবে না- এ মর্মে দলীল চাই। আর কেন নদী বা পুকুরে গোসল করা যাবে না?

-সাদিদ মাহমুদ
বরিশাল চৌমাথা।

উত্তর: গোসলের সময় সতর রক্ষা করা, অন্যের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করা উচিত। কিন্তু পুকুর বা নদী তথা খোলা জায়গায় গোসল করলে নিজেকে আড়াল করা সম্ভব হয় না। ই‘য়ালা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে খোলা প্রান্তরে (জনসমক্ষে) লুঙ্গি বা কোনো আবরণ ছাড়া গোসল করতে দেখলেন। তখন তিনি মিম্বারে আরোহণ করলেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। এরপর বললেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত লজ্জাশীল ও আড়ালকারী, তিনি লজ্জাশীলতা ও পর্দা (আবৃত থাকা) ভালোবাসেন। অতএব, তোমাদের কেউ যখন গোসল করবে, তখন সে যেন নিজেকে আড়াল করে (পর্দা করে) গোসল করে’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪০১২)*।

প্রশ্ন (১০): ইস্তিঞ্জা করার সময় আযান কানে শোনা গেলে উত্তর দেওয়া যাবে কি? না দেওয়া গেলে দেওয়ার নিয়্যত থাকায় সে কি নেকী পাবে?

-মো. তাহেনুর রহমান
নয়নপুর, সদর, দিনাজপুর।

উত্তর: ইস্তিঞ্জা অবস্থায় আযানের উত্তর দেওয়া উচিত নয়। কারণ এটি আল্লাহর যিকির, আর এ অবস্থায় যিকির থেকে বিরত থাকা শরীআতের নির্দেশ। তবে ইস্তিঞ্জা শেষ করে ওযূ বা পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর আযানের উত্তর দিতে পারেন, যদি আযান তখনও চলমান থাকে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক ব্যক্তি সালাম দিলেন। তখন তিনি পেশাব করছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেননি, বরং তায়াম্মুম (অন্য বর্ণনায় পরিচ্ছন্ন হওয়া) করার পর উত্তর দিলেন এবং বললেন, ‘আমি পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর যিকির করতে অপছন্দ করি’ *(আবূ দাঊদ, হা/১৭)*। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা না করে, বরং শরীআতের আদব রক্ষার জন্য আযানের উত্তর না দেন এবং তার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে আযানের উত্তর দেওয়ার, তাহলে আল্লাহ তাআলা নিয়্যত অনুযায়ী ছওয়াব দান করবেন *(ছহীহ বুখারী, হা/১)*। কেননা বান্দা অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে, সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যে আমল করত, তার সমপরিমাণ ছওয়াব তার জন্য লেখা হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/২৯৯৬)*।

ছালাত

প্রশ্ন (১১): আমি মিরপুর ১২ নং দাওয়াহ সেন্টারে গিয়েছিলাম। যেহেতু তা আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদ নয়, তাই সেখানে নিয়মিত জামাআত ও জুমআর ছালাত আদায় করা কি বৈধ? একইভাবে সাধারণ মানুষ কি কর্মস্থলের বিল্ডিং, ছাদ বা কোনো কক্ষে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমআর ছালাত আদায় করতে পারবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: যখন কোনো স্থান মসজিদ হিসেবে ঘোষণা করা হবে, তখন তা ওয়াকফ হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় মসজিদগুলো কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য আর কাউকে ডেকো না' *(আল-জিন, ৭২/১৮)*। মসজিদে নববী তৈরির সময় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার মূল্য দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'হে বনূ নাজ্জার! তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের এই বাগিচার মূল্য নির্ধারণ করো। তারা বলল, না, আল্লাহর কসম! আমরা এর দাম নেব না। এর দাম আমরা একমাত্র আল্লাহর নিকটই আশা করি' *(ছহীহ বুখারী, হা/৪২৮)*। তবে প্রয়োজনে নিয়মিত জামাআত ও জুমআর ছালাত কোনো স্থানে ওয়াকফ না হলেও আদায় করা যায়। মসজিদ ঘোষণা না করে যেকোনো জায়গায় প্রয়োজনে জুমআর ছালাত আদায় করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিনে যখন ছালাতের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও' *(আল-জুমুআহ, ৬২/৯)*। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্য ছালাত আদায়ের স্থান (মসজিদ) এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম (তায়াম্মুমের মাধ্যম) বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব, আমার উম্মতের যে ব্যক্তির ছালাতের সময় উপস্থিত হবে, সে যেন সেখানেই ছালাত আদায় করে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৫২১)*।

প্রশ্ন (১২): একই মসজিদে মেহরাবে একাধিক জামাআত পড়ার বিধান কী?

-মুকাব্বির
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: অনিবার্য কারণে যে সকল মুছল্লীর প্রথম জামাআত ছুটি গেছে তারা মসজিদের মেহরাবসহ যেকোনো ফাঁকা জায়গায় জামআতবদ্ধ হয়ে ছালাত আদায় করতে পারে। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একবার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তিকে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ" '(তোমাদের মধ্যে) কেউ একজন এই লোকটির সাথে ছালাতে শরীক হয়ে কেন তাকে *(জামাআতে ছালাত আদায়ের ছওয়াব)* ছাদাকা করছে না!' *(আবূ দাঊদ, হা/৫৭৪)*। এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একই মসজিদে একাধিক জামাআত অনুষ্ঠিত করা যায় *(আউনুল মা'বূদ, ২/১৯৮)*।

প্রশ্ন (১৩): ফজরে দুটি আযান দেওয়া হয়। যেমন- বেলাল ও ইবনু উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা দিতেন। দুটি আযান কখন হবে এবং কেন দুটি আযান হয়? বুঝিয়ে বলবেন।

-মুনতাসিরা
পাবনা।

উত্তর: ফজরে দুটি আযান দেওয়া হয় এমন নয়। বরং ফজরের ওয়াক্ত আসার পূর্বে একটি এবং ওয়াক্ত শুরুর পর আরেকটি আযান দেওয়া হয়। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় বেলাল রাতে আযান দেয়, সুতরাং তোমরা ইবনু উম্মে মাকতূমের আযান দেওয়া পর্যন্ত পানাহার করো' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬২৩)*। প্রথম আযানের হিকমত হলো যারা বিতর ছালাত আদায় করেনি তারা দ্রুত আদায় করবে, যারা সাহারী সম্পন্ন করেনি তারা দ্রুত সাহারী সম্পন্ন করবে এবং ফজরের ছালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবে। আর দ্বিতীয় আযানের হিকমত হলো ফজরের মূল ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ঘোষণা, যাতে সাহারী গ্রহণ বন্ধ করা হয় এবং দ্রুত ফজরের ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে আসা হয় *(ফাতহুল বারী, ২/১০৬)*।

ছিয়াম

প্রশ্ন (১৪): প্রায় প্রতিবছর বাচ্চা নিচ্ছে এমন মায়ের ছিয়ামের বিধান কী?

-বাবুল মিয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তর: এমতাবস্থায় তিনি ছিয়ামের কাযা আদায় করবেন। যদি সম্ভবপর না হয় অর্থাৎ নিজের বা সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করেন, তাহলে তিনি রামাযানে ছিয়াম ছেড়ে দিবেন এবং প্রতিটি ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করবেন *(আবূ দাঊদ, হা/২৩১৮)*।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (১৫): যোগ্য প্রার্থী হলে কোনো নেতার মাধ্যমে সুপারিশ করে চাকরি নেওয়া যাবে কি?

-আমিনুল ইসলাম
পাবনা।

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যোগ্য ও অধিকারী হন এবং সুপারিশের মাধ্যমে কেবল তার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা হয়, তাহলে তা বৈধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন, আমানত তার হক্বদারের কাছে পৌঁছে দিতে' *(আন-নিসা, ৪/৫৮)*। কিন্তু যদি সুপারিশের মাধ্যমে অযোগ্য ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়া হয় বা অন্য যোগ্য ব্যক্তির অধিকার নষ্ট করা হয়, তাহলে তা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেককাজ ও তাক্বওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। যে ব্যক্তি কোনো মানুষের

জন্য তার ন্যায্য অধিকার আদায়ে সুপারিশ করে, সে ছওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি এমন বিষয়ে সুপারিশ করে, যার সে অধিকারী নয়, তাহলে সে যুলমের কাজে সহযোগিতা করে *(মাজমূউ আল-ফাতাওয়া, ৩১/৩৫৭–৩৫৮)*।

প্রশ্ন (১৬): মুযারাবা ও মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যবসা কীভাবে হয়? এগুলো কি শরীআতসম্মত?

-রাকিবুল ইসলাম
ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: মুযারাবা পদ্ধতি হচ্ছে এক পক্ষ মূলধন দেবে, আর অপর পক্ষ শ্রম, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা দেবে। লাভ পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে ভাগ হবে। লোকসান হলে মূলধনের লোকসান মূলধনদাতা বহন করবে, আর মুযারিবের লোকসান হবে তার শ্রম ও সময়; যদি সে অবহেলা বা চুক্তিভঙ্গ না করে। মুযারাবা বৈধ। হাকিম বিন হিযাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি যখন কাউকে মুযারাবা ভিত্তিতে অর্থ দিতেন, তখন এই শর্ত আরোপ করতেন যে, জানোয়ার ও কাঁচা অস্থায়ী মালে আমার পুঁজি লাগাবে না, আমার মাল সামুদ্রিক যানে চাপাবে না, কোনো প্লাবনভূমিতে তা নিয়ে রাখবে না। যদি তুমি এরূপ কিছু কর, তাহলে তুমি আমার মালের খেসারত দিতে বাধ্য থাকবে *(দারাকুত্বনী, হা/৩০৩৩)*। ইমাম মালিক মুওয়াত্ত্বায় বলেছেন, আলা বিন আব্দুর রহমান বিন ইয়াকূব হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ইয়াকূব) উছমান (রা.)-এর মাল নিয়ে উভয়ের মধ্যে লাভ বণ্টিত হওয়ার শর্তে ব্যবসা করেছিলেন *(সুনানে কুবরা, হা/১১৬০৬)*। মুরাবাহা হলো এমন বিক্রয়, যেখানে বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্যের ক্রয়মূল্য জানিয়ে তার সঙ্গে নির্দিষ্ট লাভ যোগ করে বিক্রি করে। মুরাবাহা বৈধ, তবে বিক্রেতাকে আগে পণ্যের মালিক হতে হবে এবং প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হতে হবে *(আল-মুগনী, ৪/১৭৬)*।

প্রশ্ন (১৭): একজন পুরুষ ইন্টার্ন চিকিৎসকের জন্য গাইনি বিভাগে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রসূতি নারীর যোনিপথ পরীক্ষা করে নরমাল ডেলিভারি শেখা কি শরীআতসম্মত? বিশেষত যখন মহিলা ডাক্তার উপস্থিত না থাকেন এবং রোগীকে অন্যত্র রেফার করার সুযোগও না থাকে, তবে ভবিষ্যৎ চিকিৎসা সেবার প্রয়োজনে এ দক্ষতা অর্জন করা জরুরি।

-মো. রবিউল ইসলাম
সদর, নীলফামারী।

উত্তর: এক্ষেত্রে নারীরা প্রশিক্ষণ দিবে এবং নারীরাই প্রশিক্ষণ নিবে; প্রশিক্ষক নারী বিধর্মী হলেও। পুরুষ ইন্টার্নের এ প্রশিক্ষণ নেওয়া বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অন্য নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৮)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মহিলারা ঢেকে রাখার বস্তু’ *(তিরমিযী, হা/১১৭৩)*।

প্রশ্ন (১৮): মজা করে কোনো বন্ধু বা কাউকে শালা বলা যাবে কি? অনুরূপভাবে বলদ, গরু, ছুঁচো, পাগল এসব বলা যাবে কি?

-জান্নাতুল ফেরদৌস
চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর: কাউকে মজা করে হলেও অপমানসূচক নামে ডাকা ইসলামের আদর্শ নয়। কেননা সে এতে কষ্ট পায়, অপমানিত হয় বা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,‘ হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না। ঈমান আনার পর ফাসেকী নাম কতই না নিকৃষ্ট!’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১১)*। অর্থাৎ এমন উপাধি দিয়ে কাউকে ডাকা হারাম, যা সে অপছন্দ করে *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯/১১)*। মুসলিমের ভাষা হওয়া উচিত ভদ্র, সম্মানজনক ও উত্তম।

প্রশ্ন (১৯): আমি একজন সরকারি কর্মচারী। আমার জন্য জিপিএফ এর মুনাফা নেওয়া কি বৈধ হবে?

-কাওছার আলম
নোয়াখালী।

উত্তর: জিপিএফ (GPF) এর পূর্ণরূপ হলো General Provident Fund (জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড)। এটি সাধারণত সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক সঞ্চয় তহবিল। এতে চাকরিজীবীর বেতন থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেটে GPF-এ জমা করা হয়। তাই নিজের জমাকৃত GPF-এর মূল অর্থ গ্রহণ করা বৈধ। তবে GPF এ মুনাফার অর্থ সূদের ভিত্তিতে নির্ধারিত হলে তা গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন *(আল-বাকারা, ২/২৭৫)*। আর তা সূদের ভিত্তিতে নির্ধারিত না হলে তা গ্রহণ করা যায়।

প্রশ্ন (২০): আমি নিউজিল্যান্ডে পড়াশোনা করছি এবং বিবাহিত। পড়াশোনা শেষে স্ত্রীকে আমার সাথে রাখতে চাই। প্রথমে আর্থিকভাবে কিছুটা চাপ থাকবে, তাই আমার স্ত্রী টুকটাক সীমিত পর্যায়ে চাকরি করতে চাচ্ছে। তিনি পর্দা ও শালীনতা বজায় রেখে (হিজাব, মাস্ক ইত্যাদি ব্যবহার করে) কাজ করতে পারবে কি?

-আবূ সাঈম
নিউজিল্যান্ড।

উত্তর: প্রথমত, নারীদের জন্য একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাইরে বের হওয়া জায়েয নয় *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)*। দ্বিতীয়ত,

জীবিকার বিকল্প মাধ্যম না থাকায় যদি নারীকে ঘরের বাইরে গিয়ে চাকরি করতে হয়, তাহলে তার কর্মক্ষেত্র এমন হতে হবে যেখানে পর্দার পরিবেশ থাকবে এবং ফিতনার আশঙ্কা থাকবে না। পক্ষান্তরে, কর্মক্ষেত্র যদি এমন হয় যেখানে পর্দা লঙ্ঘন হয়, পরপুরুষের সাথে নিয়মিত কথা বলতে হয় এবং ফিতনার আশঙ্কা থাকে; তাহলে এমন জায়গায় তার চাকরি করা জায়েয নয়। নিউজিল্যান্ডের মতো দেশে নারীদের জন্য ফিতনামুক্ত ও পর্দাবান্ধব কর্মক্ষেত্র পাওয়া বিরল। এক্ষেত্রে উত্তম হলো আর্থিক সংকটাপন্ন অবস্থায় স্ত্রীকে না নিয়ে গিয়ে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

প্রশ্ন (২১): ইউনিয়ন সমাজকর্মী পদে চাকরি করা কি জায়েয হবে? এই পদের কাজ হলো জনগণের সেবামূলক কিছু কাজ করা। কিন্তু এর মধ্যে একটি কাজ হলো সূদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের টাকা উঠানো। (বি. দ্র. যদিও সূদমুক্ত বলা হয়, তবে ৫% সার্ভিস চার্জ বা সেবা মাশুল যুক্ত আছে)।

-জুবায়ের মাহবুব জাবেদ
সিলেট।

উত্তর: করযে হাসানা বা সূদমুক্ত ঋণ প্রদান অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ কাজ। আবূ উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার দরজায় একটি লেখা দেখতে পেল যে, ছাদাকার নেকী ১০ গুণ আর করযে হাসানার নেকী ১৮ গুণ' *(শুআবুল ঈমান, হা/৩৫৬৬; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৯০০)*। এমন ফযীলতপূর্ণ কাজে নির্দিষ্ট হারে সার্ভিস চার্জ বা সেবা মাশুল যুক্ত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সার্ভিস চার্জের মুখাপেক্ষী হয়েই যদি ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়, তাহলে এমন কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন নেই। অতএব, ঋণ পরিশোধ করার সময় নির্দিষ্ট হারে সার্ভিস চার্জ যুক্ত করা সূদের আওতাভুক্ত। আর যে পদে চাকরি করলে সূদ সংশ্লিষ্ট কাজ করতে হয়, সে পদে চাকরি করা জায়েয নয় *(আবূ দাঊদ, হা/৩৩৩৩)*।

প্রশ্ন (২২): মা'ছূমা নাম রাখা যাবে কি? জায়েয না হলে এবং নাম রেখে ফেললে করণীয় কী?

-আজিজ খান
নকলা, শেরপুর, ময়মনসিংহ।

উত্তর: মা'ছূমা (معصومة) শব্দের অর্থ গুনাহ থেকে মুক্ত, ভুল-ত্রুটি থেকে সংরক্ষিত। আলেমগণ শব্দটিকে 'নিষ্পাপ' অর্থে ব্যবহার করেন। সুতরাং এই শব্দ দ্বারা নাম রাখা মানে নফসের তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির দাবি করা, যা নিষেধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 'তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই তাক্বওয়াবানদের সম্পর্কে অধিক অবগত' *(আন-নাজম, ৫৩/৩২)*। মা'ছূমা নাম রাখা হয়ে গেলে করণীয় হলো এটাকে পরিবর্তন করে সুন্দর অর্থবহ কোনো নাম রাখা *(তিরমিযী, হা/২৮৩৯)*।

প্রশ্ন (২৩): আমি একজন ডাক্তারের ফার্মেসীতে কাজ করি। অনেক মহিলা সেখানে মেডিসিন নিতে আসে। আমি তাদের দিকে রোগী ব্যতীত অন্য কোনো নজরে তাকাই না। এভাবে তাকালে কি আমার গুনাহ হবে?

-কাউসার ইসলাম
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তর: পুরুষদেরকে পরনারী থেকে দৃষ্টি হেফাযত করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 'মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে। তারা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(আন-নূর, ২৪/৩০)*। একজন ফার্মেসীতে কাজ করা ব্যক্তির কোনো প্রয়োজন নেই নারী কাস্টমারের দিকে তাকানোর। সুতরাং আপনার জন্য দৃষ্টি হেফাযত করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২৪): bKash, Nagad, Mcash বা অন্য কোনো মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে লেনদেন (cash-in/cash-out/send money) করলে যেহেতু নির্দিষ্ট চার্জ কাটা হয়, তাহলে বিকাশ এজেন্ট হয়ে ব্যবসা করে আয় করা শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয কি-না? দলীলসহ জানতে চাই।

-সোহাইল আহমাদ
জামালপুর।

উত্তর: ইসলামে উপার্জনের পথ চারটি- ১. দিনমজুরি, ২. চাকরি, ৩. জমি চাষ ও ৪. ব্যবসা। ৪র্থ কাজটি বৈধ বিবেচনা করে করতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হতে না হারাম হতে' *(ছহীহ বুখারী, হা/২০৫৯)*। অতএব, বিকাশ, নগদে যেহেতু সেবার বিপরীতে পারিশ্রমিক নেওয়া হয়, তাই তার মূল ইনকাম হালাল; কিন্তু যেহেতু এর মূল প্রতিষ্ঠান সূদী লেনদেনের সাথে যুক্ত, তাই এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত না থাকাই ভালো। মানুষকে হারামে জড়িত করার কৌশলগুলোর মাঝে এটি একটি। তাই প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন (২৫): স্মৃতি হিসেবে মৃত ব্যক্তির কোনো ছবি বা ভিডিও মোবাইলে রাখা যাবে কি?

-সোহেল
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর: নিজের একান্ত প্রয়োজন বা দ্বীনী প্রয়োজন ব্যতীত ছবি তোলা বা ভিডিও করা জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রযিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় যারা এই ছবিগুলো অঙ্কন বা তৈরি করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রদান করা হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যাদের ছবি তৈরি করেছ, তাদেরকে জীবিত করো' *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫১)*।

মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ তার অপ্রয়োজনে তোলা ছবি বা ভিডিও এর কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হতে পারে। এজন্য তার অপ্রয়োজনে তোলা ডিজিটাল ছবি পাওয়া গেলে তা ডিলিট করা আর প্রিন্ট ছবি পাওয়া গেলে তা ছিঁড়ে ফেলা উচিত।

প্রশ্ন (২৬): বাসায় সৌন্দর্যের জন্য ক্যালিগ্রাফি করা যাবে কি?

-ইহসান
দিনাজপুর।

উত্তর: ক্যালিগ্রাফিতে যদি কুরআনের আয়াত ও হাদীছ না থাকে, কোনো শিরকী বা বিদআতী বিশ্বাস (যেমন- বরকত, হেফাযত ও বদনজর লাগা থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি) যুক্ত না থাকে এবং তাতে হারাম ছবি ও প্রতীক না থাকে, তাহলে তা দ্বারা বাসার সৌন্দর্যের জন্য ক্যালিগ্রাফি করা যায়। আর যদি তা কুরআনের আয়াত হয়, তাহলে তা দ্বারা ক্যালিগ্রাফি করা জায়েয নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে মানুষ তার আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে *(ছোয়াদ, ৩৮/২৯)*। কুরআন এজন্য নাযিল হয়নি যে, মানুষ তা নিয়ে আনন্দ করবে বা কুরআনের অবমাননা হয় এমন কিছু করবে।

প্রশ্ন (২৭): আমার বড় ভাই করোনার সময়ে মারা যান। তার একটি ব্যবসা ছিল, যা বর্তমানে আমি ও আমার দুই ভাই মিলে পরিচালনা করছি। পরিবারে আমার মা-বাবা, দুই ভাইয়ের স্ত্রী এবং আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রীসহ দুই মেয়ে একসঙ্গে একই বাসায় থাকি। ব্যবসার আয় থেকেই পরিবারের সব খরচ চালানো হয়। শরীআতের দৃষ্টিতে এভাবে মৃত বড় ভাইয়ের ব্যবসার আয় দিয়ে পুরো পরিবারের খরচ চালানো এবং একসঙ্গে বসবাস করা কতটুকু বৈধ?

-মোহাম্মদ
ফেনী।

উত্তর: (ক) একজন ব্যক্তি ইন্তিকাল করার পর তার যাবতীয় সম্পত্তিতে ওয়ারিছদের অধিকার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আপনার বড় ভাইয়ের ইন্তিকালের পর তার ব্যবসায়িক সম্পত্তিতে ওয়ারিছদের অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গেছে। অতএব, কালক্ষেপণ না করে দ্রুত এই সম্পত্তি তার ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টন করা আবশ্যক। ব্যবসায়িক সম্পত্তি বণ্টিত হওয়ার পর ওয়ারিছরা যদি পরস্পর সম্মতিতে আপনাদের তিন ভাইকে ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব দেয় এবং এর আয় থেকে পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করার অনুমতি দেয়, তাহলে তা জায়েয। (খ) প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী আপনারা যেভাবে এক বাড়িতে অবস্থান করছেন সেভাবে অবস্থান করা শর্তসাপেক্ষে জায়েয। শর্তগুলো হলো- ১. শারঈ পর্দা লঙ্ঘন না হওয়া। ২. পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা। যদি পর্দা লঙ্ঘন হয় অথবা দায়িত্ব নির্ধারিত না হওয়ার কারণে ঝগড়াবিবাদ সংঘটিত হয়, তাহলে এভাবে একত্রে বসবাস করা জায়েয হবে না *(আন-নূর, ২৪/৩০-৩১; আল-আহযাব, ৩৩/৫৩; ছহীহ বুখারী, হা/২৪৫৭; আবূ দাঊদ, হা/৪৮০০)*। তবে বড় ভাইয়ের ছেলেমেয়ে দেখার সাথে যেভাবে দায়িত্ব পালন করছেন, তা করা যায়।

প্রশ্ন (২৮): ইন্টারনেটে বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের অ্যানিমেশন ভিডিও এবং ইসলামিক কার্টুন পাওয়া যায়। এ সকল ভিডিও দেখা জায়েয হবে কি, যদি শিক্ষণীয় বিষয় থাকে?

-মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর: আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি ঈমান আনার পাশাপাশি অন্যান্য নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা এবং তাদেরকে সম্মান করা ফরয *(আল-বাকারা, ২/২৮৫)*। বর্তমানে ইসলামের নামে অনৈসলামিক কার্টুন ও ভিডিওগুলোতে বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণের ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে, যা চরম পর্যায়ের ধৃষ্টতা ও ঈমান ভঙ্গের অন্যতম কারণ। শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে বলে সরলমনা মুসলিমদের প্রতিনিয়ত ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের ঈমান ধ্বংস করার ভয়ংকর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। শিক্ষণীয় বিষয় থাকলেই কোনো কাজ জায়েয হয়ে যায় না, বরং সামান্য হারাম উপাদান থাকলেই সেটা হারাম সাব্যস্ত হয়।

প্রশ্ন (২৯): তাওরাত, যাবূর, ইনজীল কি জ্ঞানচর্চার জন্য পড়া যাবে?

-মেহেদী হাসান
গাজীপুর।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন এবং এটাকে সংরক্ষণ করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল

করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী' *(আল-হিজর, ১৫/০৯)*। পক্ষান্তরে তিনি অন্যান্য আসমানী কিতাব সংরক্ষণের ওয়াদা করেননি। ফলে সেসব কিতাবের অনুসারীরা সেই কিতাবগুলো বিকৃত করেছে। কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে তাদের এই বিকৃতির কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এসব কিতাব থেকে শিক্ষা অর্জন তো দূরের কথা, বরং ঈমানী বিচ্যুতি ঘটার প্রবল আশঙ্কা থাকে। এজন্য সাধারণ মুসলিমের জন্য এসব কিতাব অধ্যয়ন করা জায়েয নয়। উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাওরাত কিতাবের একটি পাণ্ডুলিপি এনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা হলো তাওরাতের একটি পাণ্ডুলিপি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। এরপর উমার রযিয়াল্লা-হু আনহু তাওরাত পড়তে আরম্ভ করলেন। (এদিকে রাগে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা বিবর্ণ হতে লাগল। আবূ বকর রযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, উমার! তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বিবর্ণ চেহারা দেখছ না? (মুসনাদে দারেমী, হা/৪৪৯)। শুধুমাত্র বিদগ্ধ আলেমগণ ইসলামের সত্যতা ও বিজাতীয় ধর্মগ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশের নিয়্যতে এসব কিতাব অধ্যয়ন করতে পারেন *(ফাতহুল বারী, ১৩/৫২৫-৫২৬)*।

প্রশ্ন (৩০): কেউ যদি প্রতিনিয়ত আমাদের সম্পদ আত্মসাৎ করতে চায়, মিথ্যা মামলা দিয়ে বছরের পর বছর ষড়যন্ত্র করে আমাদেরকে জায়গা দখল নিতে দেয় না, সে ক্ষেত্রে তাকে কী শাস্তি দেওয়া যায়? তার পা কিংবা হাত ভেঙে চেয়ারে বসিয়ে দিলে কি গুনাহ হবে?

-ওয়াকিল আহমেদ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর: আত্মসাৎ (অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে নিজের করে নেওয়া বা অবৈধভাবে ভোগ করা) ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না' *(আন-নিসা, ৪/২৯)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি খিয়ানত (আত্মসাৎ) করবে, কিয়ামতের দিন সে আত্মসাৎকৃত বস্তু বহন করে (সকলের সামনে) উপস্থিত হবে' *(আলে ইমরান, ৩/১৬১)*। প্রশ্নে উল্লিখিত আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টাকারী ব্যক্তিকে প্রথমত আত্মসাৎ করার ভয়াবহতা ও শাস্তি সম্পর্কে অবগত করে নছীহত করতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ 'তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখে, তাহলে সে যেন অবশ্যই তা স্বহস্তে পরিবর্তন করে। আর যদি (স্বহস্তে পরিবর্তন করতে) সক্ষম না হয়, তাহলে যেন মুখ (বাক্য) দ্বারা প্রতিবাদ করে। আর যদি এতেও সক্ষম না হয়, তাহলে যেন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে। তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯)*। ভালোভাবে উপদেশ দেওয়ার পরও যদি কাজ না হয়, তাহলে প্রশাসনের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কখনোই তাকে নিজের ইচ্ছামত শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩১): বাড়ির বিদ্যুতের মিটার, লাইন ও অধিকাংশ বিল হারাম অর্থে পরিশোধ করা হয়েছে। এ অবস্থায় আমি যদি সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে কম্পিউটারে অনলাইনে কাজ করে আয় করি, তাহলে আমার উপার্জন কি হালাল হবে?

-সাইফুল ইসলাম রেজা
মৌলভীবাজার।

উত্তর: যদি বিদ্যুতের সংযোগ বৈধভাবে নেওয়া হয়ে থাকে এবং আপনি নিজে অনলাইনে কোনো হারাম কাজে জড়িত না থাকেন, তাহলে সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে কম্পিউটারে বৈধ (হালাল) কাজ করে অর্জিত আয় হালাল হবে। যদিও বিদ্যুতের মিটার, লাইন বা বিল হারাম অর্থ দিয়ে পরিশোধ করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(আল-বাকারা, ২/২৭৫)*। তিনি আরও বলেন, 'কেউ অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আল-আনআম, ৬/১৬৪)*। কোনো ব্যক্তি যদি হারাম পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করে, তবে সেই গুনাহ অর্জনকারীর উপর বর্তায়; আর যে ব্যক্তি তার কাছ থেকে বৈধ উপায়ে তা গ্রহণ করে, তার উপর সেই গুনাহ বর্তায় না *(মাজমূউ আল-ফাতাওয়া, ২৯/৩০৭–৩০৮)*।

প্রশ্ন (৩২): আমি কি অর্থের বিনিময়ে মন্দিরে বা তাদের উপাসনার যে কোনো স্থাপনায় কাজ করতে পারব? অনেকেই বলে, মন্দির নির্মাণে ফ্রি-তে কাজ করলে গুনাহ হবে, অর্থের বিনিময়ে করলে সমস্যা নাই?

-সিজান আহমেদ
কুষ্টিয়া।

উত্তর: ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যেকোনো অবস্থায় অর্থের বিনিময়ে বা বিনামূল্যে মন্দির, প্রতিমা বা শিরক-সংক্রান্ত উপাসনালয় নির্মাণ, সংস্কার বা এমন কাজে অংশ নেওয়া যা সরাসরি তাদের উপাসনাকে সহায়তা করে—এ ধরনের কাজ হারাম এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেককাজ ও তাক্বওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা

করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। মুসলিমদের জন্য কাফেরদের উৎসব বা তাদের ধর্মীয় নিদর্শন (শাআইর)-সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করা বৈধ নয় *(ইকতিদাউছ-ছিরাতিল মুস্তাকীম, ১/৪২৫)*। সুতরাং মন্দিরে বা তাদের উপাসনার যে কোনো স্থাপনায় কাজ করা এবং তার পারিশ্রমিক নেওয়া হারাম।

প্রশ্ন (৩৩): কোনো এক বিস্কুট ফ্যাক্টারীতে আমি কাজ করি। তারা বেশি লাভের জন্য অখাদ্য বা ক্ষতিকর জিনিস মানুষকে খাওয়ায়। আমি তাদের অগোচরে তা দেখে ফেলি, কিন্তু বাকি কর্মচারীরা তা জানে না। সেখানে চাকরি করা কি হালাল হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, কোম্পানি ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের জন্য ক্ষতিকর বা অখাদ্য উপাদান খাদ্যে মিশিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে বিক্রি করছে, তাহলে সেই অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা বৈধ নয় এবং সেখানে চাকরি করাও হালাল হবে না। কেননা সেখানে পাপের কাজের সহযোগিতা হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেককাজ ও তাক্বওয়ায় একে অপরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩৪): আমার স্বামী একটি কাঠের মিলে চাকরি করেন। কাঠ সরবরাহকারী একজন বিক্রেতার কাছ থেকে বাকিতে কেনা হয়। তার পাওনা দ্রুত আদায় করার জন্য প্রতি গাড়ি কাঠের পেমেন্টের পর ব্যক্তিগতভাবে ৫০০০–৬০০০ টাকা করে দেন। তবে এ বিষয়ে আমার স্বামীর মালিক অবগত নন। উল্লেখ্য, কাঠের দাম বা মান নির্ধারণে আমার স্বামীর কোনো অনিয়ম নেই এবং মালিক বাজারদরের মধ্যেই কাঠ ক্রয় করেন। বিক্রেতার দেওয়া এই অর্থ কি আমার স্বামীর জন্য হালাল?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: পাওনা টাকা দ্রুত পরিশোধ করায় পুরস্কার হিসেবে কিছু টাকা প্রদান করা জায়েয *(দারাকুত্বনী, হা/২৯৮০; ইবনুল কাইয়িম, আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ১/৩৯৫-৩৯৬)*। কিন্তু এই পুরস্কার যেহেতু মূল পেমেন্টের উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়, আর মূল পেমেন্ট মিলের মালিকের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়, তাই এই পুরস্কারের আসল হক্বদার মিলের মালিক। সুতরাং তাকে এই পুরস্কার সম্পর্কে অবগত করা আবশ্যক। এরপর যদি তিনি পুরস্কার থেকে কিছু অংশ আপনার স্বামীকে প্রদান করেন, তাহলে তা আপনার স্বামীর জন্য জায়েয। অতএব মালিককে জানিয়ে করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৫): আমি শুনেছি, ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের কোনো লিমিট নেই। প্রশ্ন হলো, কোনো ক্রেতা যদি পণ্যের দামের ব্যাপারে না জানে এবং বিক্রেতা যদি তাকে ঠকানো বা বেশি লাভের জন্য অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে সেটা বিক্রি করে, তাহলে কি সেটা হারাম হবে?

-মো. নাছিম আহমেদ
ছাতিহাটী, ছাতিহাটী-১৯০০, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের সীমা নেই মানে এই নয় যে, ক্রেতাকে ঠকিয়ে মাত্রাতিরিক্ত চড়া মূল্যে পণ্য বিক্রি করা যাবে। এমন করলে তা হারাম হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, من غشنا فليس منا 'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)*। অতএব, বাজারদর ও ক্রয়মূল্যের সাথে মিল রেখে স্বাভাবিক নির্ধারিত মাত্রায় লাভ করতে হবে, যাতে ক্রেতা একই পণ্যের সঠিক মূল্য জেনে নিজেকে ধোঁকাগ্রস্ত মনে না করে।

বিধি-বিধান

প্রশ্ন (৩৬): জিহাদের বিধান কী এবং জিহাদের ঘোষণা দেওয়ার অধিকার কার? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানতে চাই।

-আশিক ইকবাল
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর: জিহাদ অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। নফস, শয়তান ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদও এর অন্তর্ভুক্ত *(ফাতহুল বারী, পৃ. ৬/৫)*। কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয, চাই সেটা হাত দিয়ে হোক বা যবান দিয়ে হোক বা মাল দিয়ে হোক কিংবা অন্তর দিয়ে হোক *(ফাতহুল বারী, হা/২৮২৫-এর ব্যাখ্যা, পৃ. ৬/৪৫)*। ময়দানের জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ থাকতে হবে- (১) ইসলাম, বালেগ ও সুস্থ বুদ্ধি *(আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩)*। (২) পুরুষ হওয়া *(ছহীহ বুখারী, হা/১৫২০)*। (৩) স্বাধীনতা, দাসের উপর (জিহাদ) ফরয নয়, তবে তার মালিকের অনুমতি থাকলে ব্যতিক্রম। (৪) শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতা থাকা *(আত-তাওবা, ৯/৯১)*। (৫) পিতা-মাতার অনুমতি থাকা *(ছহীহ বুখারী, হা/৩০০৪)*। (৬) শাসক/নেতার অনুমতি থাকা। জিহাদের ঘোষণা দেওয়ার অধিকার একমাত্র মুসলিম শাসকের, যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/২৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৫)*। তবে কিছু ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। যেমন- (১) মুসলিমদের বাড়িতে বা শহরে শত্রুবাহিনী উপস্থিত হলে *(আত-তাওবা, ৯/১২৩)*। (২)

শাসক যখন কাউকে যুদ্ধে বের হওয়ার নির্দেশ দেন *(ছহীহ বুখারী, হা/২৭১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮১৮)*। (৩) যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত হলে *(আল-আনফাল, ৮/১৫, ৪৫)*।

প্রশ্ন (৩৭): গীবত কাকে বলে? গীবতের বিধান কী?

আব্দুল্লাহ আল-আমিন
রাজশাহী।

উত্তর: গীবত হলো কোনো মুসলিম ভাইয়ের পশ্চাতে তার এমন দোষ-ত্রুটির কথা আলোচনা করা, যা শুনলে সে কষ্ট পায় *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৯)*। গীবত অত্যন্ত জঘন্য পাপের কাজ। ইসলামী শরীআতে এটাকে হারাম করা হয়েছে এবং মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া যেমন হারাম, অনুরূপভাবে গীবত করাও হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাকো; কেননা অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত, তোমরা তো তাকে ঘৃণা করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১২)*।

প্রশ্ন (৩৮): ইবলীস শয়তানকে মনে মনে অনেক গালিগালাজ করি। মানুষের ভুল দেখলেই মনে মনে অনেক গালিগালাজ করি। এর বিধান কী? এতে করে আমার কোনো পাপ হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
কুমিল্লা।

উত্তর: ইবলীসকে গালিগালাজ বা মন্দ কথা বলার প্রয়োজন নেই। তবে তার ব্যাপারে অভিশাপের কথা এসেছে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৫৩)*। আর শয়তানদের নেতা হলো ইবলীস। তার উপর আল্লাহ তাআলা লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ 'এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত অবশ্যই তোমার (ইবলীসের) প্রতি রইল লা'নত (অভিশাপ)' *(আল-হিজর, ১৫/৩৫)*। সুতরাং অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু দেখে ইবলীসকে লা'নত করা যায়। কিন্তু লা'নত করলে তার কুমন্ত্রণা থেকে সুরক্ষা লাভ করা যায় না। এজন্য উত্তম হলো আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম বলা (অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'যদি শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আপনি (তার কুমন্ত্রণা থেকে) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(আল-আ'রাফ, ৭/২০০)*।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৩৯): ২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি আমি রাগের মাথায় স্ত্রীকে এক তালাক দিই এবং কয়েক মিনিট পর রুজূ করে সংসার শুরু করি। পরে ২৫ মার্চ ও ২৬ মার্চ ফোনে আরও দুইবার তালাক দিই। তখন আমি ধারণা করেছিলাম, স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন এবং হায়েয অবস্থায় ছিলেন; কিন্তু পরে তিনি জানান, ১৫ মার্চ গর্ভপাত হয়ে গিয়েছিল এবং ২৫ ও ২৬ মার্চ তিনি হায়েয অবস্থায়ও ছিলেন না। এ অবস্থায় আমার দেওয়া তিন তালাকের শারঈ হুকুম কী? আমার স্ত্রী কি এখনও আমার জন্য হালাল আছেন, নাকি তিন তালাক সম্পূর্ণ কার্যকর হয়ে গেছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ইদ্দতের মাঝে একই তুহূরে তালাক দিলে সেই তালাক সংঘটিত হবে না *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৭২)*। সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী দুই তালাক সংঘটিত হয়েছে এবং স্ত্রী তার স্বামীর জন্য এখনও হালাল রয়েছে। যদি স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারে *(আশ-শারহুল মুমতি, ১৩/৯৪)*। তালাক দেওয়ার পর ৯০ দিন স্বামী কিছু না বললে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাই এখন ফিরিয়ে নিতে হলে নতুন বিবাহ হতে হবে।

প্রশ্ন (৪০): বর্তমানে অনেক নাস্তিক বলে, সূরা তালাক এর ৪ নম্বর আয়াতে আছে, ইসলামে শিশু বাচ্চাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা জায়েয। এটা কি ঠিক?

-রায়হান
বি-বাড়িয়া।

উত্তর: নাস্তিকরা ইসলামের শত্রু। তারা অন্যান্য ধর্মের আপত্তিযোগ্য বিষয়গুলো দেখেও না দেখার ভান করে, অথচ ইসলামের মধ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোনো ত্রুটির দেখা না পেয়ে উন্মাদের মতো আচরণ করে। উক্ত প্রশ্নের বিবরণ তাদের এই উন্মাদ আচরণের তালিকায় আরেকটি সংযোজন মাত্র। সূরা তালাকের ৪ নম্বর আয়াতে যা আছে তা হলো, আল্লাহ বলেন, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 'তোমাদের যে সকল স্ত্রীর আর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা যদি দ্বিধাগ্রস্ত হও, তাহলে (জেনে নাও) তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস এবং যারা এখনও ঋতুমতী হয়নি, তাদেরও (ইদ্দত তিন মাস)। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে তার যাবতীয় বিষয় আল্লাহ সহজ করে দেন'। এই আয়াতের একটি অংশে বলা হয়েছে, যারা এখনও

ঋতুমতী হয়নি তাদের যদি বিয়ের পর তালাক হয়ে যায়, তাহলে তাদের ইদ্দত পালন করতে হবে তিন মাস। ইসলামী শরীআতে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ঋতুমতী হওয়া জরুরী নয়, বরং অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী হলেও তার সাথে বিবাহের আকদ জায়েয। কিন্তু আকদ জায়েয হওয়া মানেই সহবাস জায়েয হওয়া নয়। সহবাস জায়েয হওয়ার জন্য সেই নারীকে সহবাসযোগ্য হতে হবে। আর এটা বয়সের মানদণ্ডে নির্ধারিত হয় না। কেউ অল্প বয়সে সহবাসযোগ্য হয়ে যায়, আবার কেউ বয়সে বেশ বড় হওয়া সত্ত্বেও সহবাসযোগ্য হয় না। আর একারণেই সহবাসযোগ্য নয় এমন স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে পাঠানোর ক্ষেত্রে ইসলাম আবশ্যকতা রাখেনি *(আল-মুগনী, ৭/২৫৯)*। ইসলামের এই ইনছাফপূর্ণ বিধানের সৌন্দর্য নাস্তিকদের পাপী মস্তিষ্ক ধারণ করতে সক্ষম হয় না। তাই তারা নেতিবাচকভাবে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে যে, ইসলাম মেয়ে শিশুদের সাথে শারীরিক সম্পর্ককে বৈধ করেছে। অথচ ইসলাম নিঃশর্তভাবে এটা করেনি। বরং যৌক্তিক ও ইনছাফপূর্ণ শর্তাবলি আরোপ করার মাধ্যমে এই বিধানকে সুশৃঙ্খল ও উপযোগী করেছে। এই বিধানের সৌন্দর্য অবলোকন করার জন্য হেদায়াতের নূর প্রয়োজন, যা নাস্তিকদের মধ্যে অনুপস্থিত।

প্রশ্ন (৪১): আমি বাবা-মা ও বিবাহিত বড় বোনকে সরাসরি ছালাত বা ইবাদতের কথা বলি না, শুধু তাদের হেদায়াতের জন্য দু'আ করি। এ অবস্থায় তারা যদি ইবাদত না করে, তবে তাদের প্রতি দাওয়াত না দেওয়ার কারণে আমার কোনো গুনাহ হবে কি? আর আমি নিজে আল্লাহর হুকুম মেনে চললে কি একাই জান্নাতে যেতে পারব?

-মেরাজ
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর: এমতাবস্থায় সরাসরি দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াত না দিলে উভয়ের অবস্থা একই হবে। এখন দোআ করে লাভ হবে না। বরং পরিবারের সদস্যদের দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো' *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'তোমার পরিবারকে ছালাতের নির্দেশ দাও এবং এ ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করো' *(ত্ব-হা, ২০/১৩২)*। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তাআলা শীঘ্রই তোমাদের উপর তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তাঁর নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ গ্রহণ করবেন না' *(তিরমিযী, হা/২১৬৯)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মানুষ যখন কোনো খারাপ কাজ হতে দেখে, অথচ সেটাকে পরিবর্তন করে না, অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তাআলা তাদের উপর তাঁর আযাব নাযিল করবেন'। অন্য বর্ণণায় আছে, 'যে জাতির মধ্যে পাপাচার হয়, আর সে জাতির পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেটার পরিবর্তন না করে, তাহলে অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি প্রদান করবেন' *(ইবনু মাজাহ, হা/৪০০৫; আবূ দাঊদ, হা/৪৩৩৮)*।

উত্তরাধিকার বিধান

প্রশ্ন (৪২): আমার বাবা তার নিঃসন্তান ফুফার কাছ থেকে দানসূত্রে সম্পত্তি লাভ করেছিলেন। আমরা আট ভাইবোন। বর্তমানে আমার দুই ভাই দাবি করছেন যে, বাবা মৃত্যুর আগে মৌখিকভাবে অছিয়ত করে গেছেন, যেন আমরা অন্য ভাইবোনেরা তার পৈতৃক সম্পত্তিতে কোনো দাবি না করি। এ বিষয়ে আমরা বা আমাদের মা কেউ অবগত নই। প্রশ্ন হলো, কোনো বাবা কি অছিয়তের মাধ্যমে তার সন্তানদের বৈধ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন? যদি এমন অছিয়ত করে থাকেন, তবে তা কি শরীআতসম্মত এবং আমরা কি তা মানতে বাধ্য? উত্তরাধিকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে করা এমন অছিয়তের বিধান কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: এভাবে অছিয়ত করা জায়েজ নয়। কোনো বাবা অছিয়তের মাধ্যমে তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না। এমন অছিয়ত শরীআতসম্মত নয় এবং তা মানা উত্তরাধিকারীদের উপর আবশ্যক নয়। আবূ উমামা আল-বাহেলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিছের জন্য অছিয়ত করা যাবে না *(আবূ দাঊদ, হা/২৮৭০, তিরমিযী, হা/২১২০)*।

কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৩): মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাতে বর্ণিত আছে যে, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা নাকি নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর জানাযা মসজিদে পড়িয়েছেন! এটা কতটুকু সত্য? এর সনদ ও ব্যাখ্যা কী?

-শাহিদুল ইসলাম
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: এটি প্রচলিত মিথ্যা কথা। কেননা আম্মাজান আয়েশা ছিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুবরণ করেছেন ৫৮ হিজরী সনে *(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১৮৫–১৯৩)*। আর নু'মান বিন বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করেছেন ৬৫/৬৪ হিজরী সনে *(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/১৬১-১৬৮)*। সুতরাং নু'মান বিন বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুবরণের সময় মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জীবিত ছিলেন না।

প্রশ্ন (৪৪): কুরআনের সূরা আল-বাকারা, ২/২৫৬-এ বলা হয়েছে, 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই'। তাহলে ইসলামী ফিকহে ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ) সম্পর্কে যে শাস্তির আলোচনা পাওয়া যায়, সেটি এই আয়াতের সাথে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

-ইবরাহিম
ফার্মগেট, ঢাকা।

উত্তর: এ দুইটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, কারণ উভয়টি ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই' *(আল-বাকারা, ২/২৫৬)*-এর অর্থ হলো, কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানো যাবে না। কারণ এই আয়াতটি মূলত সেই অমুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে শুরু থেকেই ইসলামে প্রবেশ করেনি। কিন্তু কেউ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলিম হিসেবে সে শরীআতের বিধানের অধীন হয়। এরপর শরীআত নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে প্রকাশ্যে ধর্মত্যাগ করলে রিদ্দাহর বিচারিক বিধান প্রযোজ্য হবে। কেননা তাকে শাস্তি দেওয়ার মধ্যে দ্বীন এবং দ্বীনের অনুসারীদের সংরক্ষণ রয়েছে *(মাজমূউ আল-ফাতাওয়া, ২০/১০২)*। উদাহরণস্বরূপ, কাউকে জোর করে কোনো প্রতিষ্ঠানের সদস্য বানানো যায় না। কিন্তু কেউ স্বেচ্ছায় সদস্য হওয়ার পর সেই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ভঙ্গ করলে, সে প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত শাস্তির আওতায় আসবে। তাই সূরা বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াত ইসলামে প্রবেশের স্বাধীনতার কথা বলে, আর রিদ্দাহর বিধান ইসলাম গ্রহণের পর শরীআতের অধীন একজন মুসলিমের বিচারিক বিধান। এ কারণে এ দুইটির মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই।

প্রশ্ন (৪৫): সোশ্যাল মিডিয়ায় ইবনু তায়মিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর নামে প্রচার হচ্ছে, 'কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে দুনিয়াতে ভালোবাসে, কিন্তু তাকে বিবাহ করতে না পারে। তারপর তার মোহরানা পরিমাণ দান করে দিয়ে আল্লাহর কাছে তাকে আখেরাতের জন্য স্ত্রী হিসেবে চায়, তাহলে আল্লাহর কাছে সে এটা পেয়ে যাবে আশা করা যায়' (আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, ৫/৪৬১)। এটা কি সঠিক?

-আয়াত উল্যা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর: আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা গ্রন্থে ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর উক্ত বক্তব্য বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এটাও জানা জরুরী যে, নির্দিষ্টভাবে ছাদাকা করার ফযীলত এবং আখেরাতে নির্দিষ্টভাবে কিছু লাভ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অহী নির্ভর হয়ে থাকে। আর উক্ত বক্তব্য কোনো আয়াত বা হাদীছের বক্তব্য নয়। সুতরাং এটাকে চূড়ান্ত ভাবা যাবে না। আর এজন্যই ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ 'আশা করা যায়' বাক্য ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন (৪৬): রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মানুষকে উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করতে বলেছিলেন। উটের প্রস্রাব পান করতে বলার হিকমত কী?

-খালেদ
ময়মনসিংহ।

উত্তর: উরায়না ও উকাল গোত্রের কিছু লোক মদীনায় আগমন করার পর আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এবং পেটের অসুস্থতা সম্পর্কে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবগত করে। তখন তিনি তাদেরকে উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করতে বলেন *(ছহীহ বুখারী, হা/২৩৩)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উটের প্রস্রাব পান করতে বলেছিলেন ঔষধ হিসেবে। কারণ তিনি অহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন যে, উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করলে তারা সুস্থ হয়ে যাবে। এছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে পেট সংক্রান্ত বিশেষ রোগের চিকিৎসায় উটের প্রস্রাব কার্যকর বলে প্রমাণিত *(যাদুল মাআদ, ৪/৪২-৪৪; ফাতহুল বারী, ১/৩৩৮-৩৩৯)*।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৭): অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করে না। এই ঋণখেলাপীদের ব্যাপারে ইসলামে কী বলা আছে?

-মুমতাহিন
বংশাল, ঢাকা।

উত্তর: বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি তথা ব্যাংক খাতের অন্যতম বড় সমস্যা হলো ঋণখেলাপি, যা দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। ঋণখেলাপির এই বিপুল পরিমাণ টাকা যদি সঠিকভাবে আদায় করা যেত, তাহলে দেশের চলমান সংকট হয়তো অনেকাংশে নিরসন করা সম্ভব হতো। এক শ্রেণির অসাধু মানুষ ঋণখেলাপিকে সফলতার জাদুর কাঠি ভাবে। প্রভাব খাটিয়ে ঋণ এড়ানোকে নিজের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ মনে করে। অথচ খেলাপির উদ্দেশ্যে নেওয়া এই ঋণ তার দুনিয়া ও আখেরাত সবকিছু ধ্বংস করে দেবে। অর্থাৎ খেলাপির উদ্দেশ্যে ঋণ নেওয়ার অর্থই হলো, ইহকাল-পরকাল ধ্বংস করার দ্বার উন্মুক্ত করা। কারণ ঋণখেলাপী যতক্ষণ তার ঋণ পরিশোধ না

করবে, ততক্ষণ অন্য কোনো ইবাদত দিয়ে সে পরকালীন মুক্তি পাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঋণ ছাড়া শহীদের সব গুনাহই ক্ষমা করে দেওয়া হবে' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৮৬)*। অথচ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ ব্যক্তির পুরস্কার হলো জান্নাত তথা যাবতীয় পাপ থেকে মুক্তি। কিন্তু এত বড় পুণ্যের কাজ করেও ঋণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগ নেই। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার ঋণ পরিশোধ করা ছাড়া এক ধাপও নড়তে পারবে না। সেদিন তার কাছে ঋণ পরিশোধ করার জন্য টাকা-পয়সা, দীনার-দিরহাম কিছুই থাকবে না। সেদিন তাকে তার নেক আমল দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে, যদি নেক আমল না থাকে, তাহলে পাওনাদারের পাপের বোঝা নিজের মাথায় নিতে হবে *(ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)*। নবীজি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযায় পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতেন না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যখন কোনো ঋণী ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, 'সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ রেখে গেছে কি?' যদি তাঁকে বলা হতো যে, সে তার ঋণ পরিশোধের মতো সম্পদ রেখে গেছে, তখন তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করতেন। নতুবা বলতেন, 'তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করে নাও'। পরবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ তাঁর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, তখন তিনি বললেন, 'আমি মুমিনদের জন্য তাদের নিজের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। তাই কোনো মুমিন ঋণ রেখে মারা গেলে সে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, সে সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য' *(ছহীহ বুখারী, হা/২২৯৮)*। আরেক হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তাআলা তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার নিয়্যতে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করেন' *(ছহীহ বুখারী, হা/২৩৮৭)*। আল্লাহ তাআলা ঋণখেলাপীদের হেদায়াত দান করুন এবং ঋণখেলাপি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দেশের অর্থনীতি সুরক্ষিত রাখুন- আমীন!

প্রশ্ন (৪৮): জাদুর প্রভাবে কোনো ব্যক্তি কি পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে? যদি হয়, তাহলে সে কি সেই পাপের জন্য গুনাহগার হবে, নাকি জাদুর প্রভাবের কারণে দায়মুক্ত থাকবে?

-মোস্তাকিম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: জাদুর প্রভাবে যেকোনো ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। কেননা জাদুর প্রভাব রয়েছে *(আল-বাকারা, ২/১০২; ছহীহ বুখারী, হা/৩২৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৮৯)*। জাদুর প্রভাব মানুষের হৃদয় ও শরীরে পড়ে। এর দ্বারা অসুস্থতা, মৃত্যু এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে—আল্লাহর অনুমতিতে *(মাজমূউ আল-ফাতাওয়া, ১৯/৩৫–৩৮)*। তবে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে কি-না, তা নির্ভর করবে তার জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও নিয়ন্ত্রণ এর উপর। যদি জাদুর কারণে তার বিবেক-বুদ্ধি বা ইচ্ছাশক্তি এমনভাবে লোপ পায় যে, সে নিজের কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়, তাহলে সে দায়মুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না' *(আল-বাকারা, ২/২৮৬)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি থেকে কলম (গুনাহ লেখা) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে... পাগল থেকে, যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসে' *(আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩)*। কিন্তু যদি জাদু শুধু প্ররোচনা বা প্রভাব সৃষ্টি করে; অথচ সে নিজের ইচ্ছায় পাপ করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কর্মের জন্য দায়বদ্ধ *(আল-মুদ্দাছছির, ৭৪/৩৮)*।

প্রশ্ন (৪৯): কোনো ব্যক্তির নামে বৃক্ষরোপণ করা সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

-মো. রিয়াজুল ইসলাম
দক্ষিণ শশীদল, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।

উত্তর: আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গাছ লাগিয়ে তার ছওয়াব কোনো মুসলিম ব্যক্তির নামে ছাদাকা করলে তা ছাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে গণ্য হবে। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মুসলিম যদি একটি গাছ রোপণ করে অথবা কোনো শস্য চাষ করে, অতঃপর তা থেকে কোনো পাখি, কোনো মানুষ কিংবা কোনো পশু আহার করে; তবে তার জন্য তা ছাদাকা হিসেবে গণ্য হয় (ছহীহ বুখারী, হা/২৩২০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৩)।

প্রশ্ন (৫০): সূরা ফাতেহার শেষে ض (দু'আদ/জোয়াদ) আছে। এটির সঠিক উচ্চারণ কোনটা হবে?

-আ. হামিদ
বগুড়া।

উত্তর: জিহ্বার গোড়ার ডান অথবা বাম কিণারাকে তার বরাবর উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে ض হরফটি উচ্চারিত হয় *(আত-তাহদীদ ফিল ইতক্বান ওয়াত-তাজভীদ, ১/১০৫)*। বাংলায় জোয়াদ বা দু'আদ লিখে এই হরফের সঠিক উচ্চারণ নির্ণয় করা যায় না। তবে ض হরফটির সঠিক উচ্চারণের কাছাকাছি বাংলা উচ্চারণ 'য' দিয়ে করা যায়। অভিজ্ঞ ক্বারী ছাহেবের নিকট মশক্ব করে এই হরফসহ বাকি সব হরফের উচ্চারণ শিখে নেওয়া আবশ্যক।

সম্পাদকীয়-এর বাকি অংশ

অর্থাৎ একদিকে অর্থনৈতিক শক্তি, অন্যদিকে সামরিক প্রযুক্তি এবং তৃতীয়দিকে nuclear deterrence।

এখন বড় প্রশ্ন হচ্ছে—এই জোট কার বিরুদ্ধে?

অনেকে বলছেন, এটি ইরানকে ঠেকানোর জন্য। কিন্তু বাস্তবতা এতটা সরল নয়।

২০২৩ সালে চীনের মধ্যস্থতায় ইরানের সাথে সঊদী আরবের যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি হয়েছিল, রিয়াদ তা এখনো লঙ্ঘন করেনি। ২০২৬ সালের এই যুদ্ধ চলাকালীন সঊদী আরব তার ভূখণ্ডে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি এবং নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহার করে ইরানে কোনো আক্রমণাত্মক মিশন বা বোমাবর্ষণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। পাশাপাশি পাকিস্তান যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, অবশ্যই সেখানে সঊদীর সমর্থন আছে। এমনকি খামেনির জানাযাতেও সঊদী আরব অংশগ্রহণ করেছে। অন্যদিকে সঊদী আরব আবার ইয়ামানের হুথি এবং ইরাকের মিলিশিয়াগুলোর বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। যার বেশিরভাগ ইরান-সমর্থিত। এটি থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়, সঊদী আরব ইরানের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু ইরান-সমর্থিত প্রক্সিগুলোকে সমর্থন করে না। আর এমনটাই সিরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান আহমাদ আশ-শারার আল-জাযীরাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ফুটে উঠেছে।

অনেকেই মনে করছেন এটি একটি আমেরিকা-সমর্থিত জোট। ফলত এটির কোনো কার্যকারিতা থাকবে না। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, ইসরাঈল যা চাচ্ছে সেটি সে আমেরিকার মাধ্যমেই করাচ্ছে। আমেরিকাতে ইসরাঈলের অর্থনৈতিক ও মিডিয়া শক্তি অত্যন্ত প্রভাবশালী। একইভাবে আরব দেশগুলো যদি তাদের অর্থকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকাকে দিয়ে কিছু করাতে পারে, সেটি কখনোই খারাপ কিছু নয়। যেমন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগচি একটি সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন, আমেরিকা কুর্দিদের দিয়ে ইরানে স্থল অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বিষয়টি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বোঝানোর কারণে আর বাস্তবায়িত হয়নি। অতএব সম্পর্ক সবসময় খারাপ নয়। তবে মক্কা চুক্তি যারা ভালোভাবে অনুধাবন করেছেন, তারা বুঝবেন এটি মূলত আমেরিকা ও ইসরাঈলের বলয় থেকে বের হয়েই স্বতন্ত্র একটি চুক্তি। যেমন সাবেক ইসরাঈলি প্রেসিডেন্ট নাফতালি বেনেট এক বক্তব্যে বলেন, Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us by forming a Sunni axis with nuclear Pakistan. তথা, তুরস্ক চেষ্টা করছে সঊদী ও নিউক্লিয়ার শক্তিধর পাকিস্তানকে নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে একটি সুন্নী অক্ষ তৈরি করতে। তার এই বক্তব্য প্রমাণ করে এটি আমেরিকা-ইসরাঈল নিয়ন্ত্রিত কোনো জোট নয়। পাশাপাশি আমিরাতের এই জোটে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা কম। কেননা তারা ইসরাঈলের মতোই সম্পূর্ণরূপে ইরান ধ্বংসের মধ্যে সমাধান দেখে। আর সঊদী, তুরস্ক ও পাকিস্তান এই অঞ্চলে বড় কোনো যুদ্ধ চায় না। তারা ইরানের সার্বভৌমত্বকে গুরুত্ব দেয়, কিন্তু ইরানের প্রক্সি যুদ্ধকে সমর্থন করে না।

তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, আদৌ এই জোট কোনো কার্যকরী জোট হবে কি না?

কেননা মুসলিমদের জোট করার অতীত অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। মুসলিম বিশ্বের OIC আছে, D-8 আছে, GCC আছে, আরব লীগ আছে; সংগঠনের অভাব নেই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। মক্কা ডিফেন্স প্যাক্টের এই তিন দেশেরও স্বার্থ সবসময় অভিন্ন নয়। সঊদীর সমস্যা হুথিদের সাথে। তুরস্কের সমস্যা কুর্দি ও গ্রিসের সাথে। পাকিস্তানের সমস্যা বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানে। এই সকল লোকাল সমস্যা অন্য দেশ নিজের ঘাড়ে কীভাবে নেবে? অনেকেই এই জোটকে এক ধাপ আগ বাড়িয়ে মুসলিম ন্যাটো বলছেন। অথচ যুদ্ধ শুরু হলে NATO-কে শূন্য থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় না—কে কোথায় সেনা পাঠাবে, কোন বিমানঘাঁটি ব্যবহার হবে বা command structure কী হবে। এগুলো সবই ন্যাটোর পূর্বনির্ধারিত এবং সমন্বিত কাঠামোয় রয়েছে। Joint Defence Council, Permanent Military Headquarters, Integrated Air and Missile Defence, Joint Intelligence Centre, Rapid Reaction Force এবং Defence Industrial Board—এ ধরনের অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যাটো একটি স্বয়ংক্রিয় সচল প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে ন্যাটোর নেতা আমেরিকা। সকল সদস্য দেশ একপ্রকার তার কথা শুনতে বাধ্য। পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নও সচল থাকে, কেননা সেখানেও সিদ্ধান্ত মানার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। জবাবদিহিতার সিস্টেম রয়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলিম বিশ্বের কোনো জোটেই কোনো বাধ্যবাধকতা বা জবাবদিহিতার সিস্টেম নেই। ফলত জোট গঠন হলেও কোনো কার্যকারিতা থাকে না। এই জোটও তখনই কার্যকর হবে, যখন ন্যাটোর মতো সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি সমন্বিত সামরিক সিস্টেম থাকবে। পাশাপাশি সকল রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা ও বাধ্যবাধকতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকবে।

তবে এই চুক্তির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দিক যুদ্ধ নয়; বরং নিজস্ব প্রতিরক্ষা শিল্প তৈরি করা। সঊদীর capital, তুরস্কের defence technology এবং পাকিস্তানের missile ও military expertise একত্র হলে ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র, air defence system, naval platform, ammunition, satellite ও cyber technology-তে বড় ধরনের যৌথ উৎপাদন সম্ভব। এই জোটের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব অন্তত সামরিক শিল্পে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হতে পারবে। আমরা চাই, বাংলাদেশও এই চুক্তিতে যুক্ত হয়ে ভারতের বলয় থেকে বের হয়ে আসার রাস্তা খুঁজুক। মহান আল্লাহ এই জোটকে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য কবুল করুন- আমীন! *(প্র. স.)*

www.al-itisam.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
সহীহ্ মানহাজ অনুযায়ী হজ্জ পালনে
১৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন...
হজ্জ মোয়াল্লেম দ্বারা পরিচালিত
প্রতি রমজান মাসে মানসম্মত ওমরা প্যাকেজ করা হয়।
ইসলাহ হজ্জ গ্রুপ বাংলাদেশ
HL NO- 1299/263, Umra- 483
হজ্জ ২০২৭/২০২৮
সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে
২০২৭ সালের ফাইনাল নিবন্ধন
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং পর্যন্ত
আমাদের সেবা সমূহ ঃ
হারাম শরিফের অতি নিকটে আবাসন।
দেশি বাবুর্চি দ্বারা ৩ বেলা বাঙ্গালী খাবার।
মক্কা-মদিনায় দর্শনিয় স্থান সমূহ পরিদর্শন।
অভিজ্ঞ গাইডের মাধ্যমে হাজীদের তত্ত্বাবধান।
তায়েফ, জেদ্দা, বদর স্থান সমূহ আলাদা ভাবে পরিদর্শনের ব্যবস্থা।
শর্ত সাপেক্ষে ফ্যামেলি রুমের ব্যবস্থা করা হয়।
অসুস্থ হাজীদের দ্রুত তম সময়ে বাংলাদেশ হজ্জ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা।
অসুস্থ হাজীদের শর্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনে হুইল চেয়ারের মাধ্যমে হজ্জ করানোর ব্যবস্থা।
পবিত্র হজ্জ হোক আপনার ইবাদতের শ্রেষ্ঠ যাত্রা।
হজ্জ ব্যবস্থাপনায় মোয়াল্লেমুল হুজ্জাজঃ
শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব
প্রাক্তন হাফেজ ক্বারী শিক্ষক
জান্নাতপুর ইসলামিক সেন্টার
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।
মোবাঃ ০১৭১১-৭২৬৪৯৫
বিঃ দ্রঃ এছাড়াও প্রতি মাসে এ ক্যাটাগরিতে ওমরা প্যাকেজ চলছে।
আমাদের ঠিকানা সমূহঃ
বগুড়া অফিস : রইচ উদ্দীন প্লাজা, খান্দার, বগুড়া।
মোবাঃ ০১৭১২-৭২৭৬২৯
লালমনিরহাট অফিস : হাতি বান্ধা, লালমনিরহাট
দুলাল উকিলের মার্কেট।
ম্যানেজার : শায়খ মাহবুবুর রহমান শাহীন।
মোবাঃ ০১৩০১-১৫২৮৭১
ঢাকা অফিস : সাত্তারা সেন্টার (লিফটের ৯ম তলা)
পল্টন, ঢাকা।

Monthly Al-Itisam الإعتصام, September 2026, Price : 30.00

সালাফী কনফারেন্স ২০২৬-২৭

অনুষ্ঠানের সময়সূচি

১০ম বার্ষিক রাজশাহী

১২ ও ১৩ নভেম্বর, ২০২৬ ইং

স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

৬ষ্ঠ বার্ষিক দিনাজপুর

১৮ ডিসেম্বর, ২০২৬

স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ, তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর

১০ম বার্ষিক নারায়ণগঞ্জ

২৮ ও ২৯ জানুয়ারি, ২০২৭ ইং

স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ, বীরহাটাব-হাটাব, বীরবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

সভাপতিত্ব করবেন

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন; মহাপরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ

বক্তব্য পেশ করবেন:

সালাফী মানহাজের অনুসারী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম

আয়োজনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

ব্যবস্থাপনায়: আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী। মোবা: ০১৪০৭-০২১৮১৫